নিজেকে জানো
বিদ্যুৎ মিত্র
সেবা

একটি অতি প্রয়োজনীয় বিদ্যা

নিজেকে জানো

বিদ্যুৎ মিত্র

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ আগস্ট, ১৯৭৮

পঞ্চম মুদ্রণ আগস্ট, ১৯৮৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আসাদুজ্জামান

মুদ্রণে
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং-৮৫০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Nijekey Jano
By : Bidyut Mitra

নিজেকে জানো

বিদ্যুৎ মিত্র

প্রফেসার

এম. ইউ. আহমেদ সাহেবের

করকমলে—

যাঁর কাছে আমি

চিরঋণী।

ভূমিকা

স্বনামে ও ছদ্মনামে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন সময়ে আলোচনা প্রকাশ করেছি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে এ-ব্যাপারে যে পরিমাণ সাড়া, এবং টুকরো টুকরো ভাবে নানান জায়গায় ছাপা হওয়ার জন্য যে পরিমাণ অনুযোগ পাওয়া গিয়েছে, তাতে বাধ্য হলাম কয়েকটি লেখা বেছে নিয়ে কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে একটি গ্রন্থের আকার দিতে।

লেখাগুলো বিভিন্নমুখী। কিন্তু আমার ধারণা, একটি রচনাও 'নিজেকে জানো'—এই শিরোনামের আওতা বহির্ভূত নয়। এই ধরনের লেখায় পাণ্ডিত্য (থাকুক বা না থাকুক) প্রদর্শনের চেষ্টা করে আত্মতৃপ্তি লাভের যথেষ্ট সুযোগ ছিল; কিন্তু পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করতে পারবেন, আমি সে সুযোগ হেলায় হারাতে চেয়েছি। এ লেখা পণ্ডিতের জন্য নয়। সহজ, সাধারণ মানুষের জন্য।

তত্ত্বকে বাদ দেয়া যায় না—তাই প্রথম দিকে কিছুটা তত্ত্বমূলক আলোচনায় যেতেই হয়েছে আমাদের। কিন্তু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে, তত্ত্ব শিক্ষার চেয়ে গোটা বইয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব ও প্রাধান্য পেয়েছে তত্ত্বের বাস্তব-প্রয়োগ-শিক্ষার দিকটা। আলোচনাগুলো একের পর এক এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে কিভাবে তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করে আমরা জীবনের নানান ক্ষেত্রে উপকৃত হতে পারি সে ধারণাটা ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে আসে।

এইসব আত্মোন্নয়নমূলক আলোচনা গ্রন্থাকারে একসাথে পেয়ে যদি কেউ কোনভাবে উপকৃত হন, আমার পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করব।

বিদ্যুৎ মিত্র

সূচী ঃ

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি

জন্মেছি, মরব একদিন। ঘণ্টায় ষাট মিনিট বেগে এগোচ্ছি মৃত্যুর দিকে। কিন্তু যতদিন আছি, ভালভাবে বাঁচতে চাই, পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করে নিতে চাই এই নশ্বর জীবনটাকে। আমরা সবাই।

একেক জনের একেক সমস্যা। কেউ ভুগছি অতি-আত্মসচেতনতায়। কেউ অতিমাত্রায় নাজুক : সামান্য কথাতেই চোট লেগে যায় কলজের মধ্যে। কারও সমস্যা ঋজু, কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি না—সবসময় দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ভয় আর দুশ্চিন্তা। কেউ ভুগি অতি-সতর্কতায় : যেন প্রত্যেকটা কাজেই সফল ও সঠিক হতে হবে, ফলে কাজের ডাকে ঝাঁপিয়ে না পড়ে প্রথমেই খুঁজি নিরাপদ আশ্রয়। কেউ আবার সামান্য সমালোচনাও সহ্য করতে পারি না, তাই যে-কোন কাজ করতে গিয়ে অন্য লোকে কোনটাকে ঠিক বলবে সেই রাস্তাটা আবিষ্কার করতে চাই। কারও নিজের ক্ষমতা ও বুদ্ধি-বিবেচনার উপর আস্থা নেই, কেউ নিজের চেহারার কোন খুঁত নিয়ে অনর্থক বেশি ভাবিত বা পীড়িত, কারও আবার কে কতখানি সম্মান বা স্বীকৃতি দিল কি

দিল না, তাই নিয়ে সার্বক্ষণিক দুশ্চিন্তা। কেউ কেউ এমন মানসিক পর্যায়ে চলে এসেছি, যখন সবকিছুতেই বিপদের গন্ধ পাই, সবকিছুতেই সন্দেহ—সামান্য খুক খুক কাশি দিয়েই মনে করি টিবি, বুকের কাছে একটু ব্যথা হলেই মনে হয় লাঙ-ক্যানসার—আর বাঁচবো না, সামান্য বাধাকে মনে হয় পর্বত, সামান্য ঠাট্টাকে মনে হয় মারাত্মক হামলা।

সমস্যার অন্ত নেই। কিন্তু সমস্যা যখন আছে, তার সমাধানও নিশ্চয়ই আছে। সব দোষ-ত্রুটি কাটিয়ে নিয়ে সুখী হওয়ার পথ নিশ্চয়ই আছে কোথাও। খুঁজলে নিশ্চয়ই পেয়ে যাব সেই পথ।

সেদিন ডক্টর পিটার ফ্লেচারের একটা বই হাতে এল: 'ইয়োর ইমোশনাল প্রব্লেমস'। গোড়াতেই দৃষ্টিভঙ্গিটা ঠিক করে নিতে বলেছেন ভদ্রলোক। তিনি বলছেন, ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা সৃষ্টি করে দেয়াই সত্যিকারের শিক্ষা। কিন্তু সেই সাথে তাদের পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয়া দরকার যে, কেবল কাজে পারদর্শিতা অর্জন করলেই মানুষের জীবনে পূর্ণতা আসে না; কর্ম-জীবন আর ব্যক্তিগত জীবনের চাহিদা সম্পূর্ণ অন্য রকম।

বেঁচে থাকবার তাগিদেই কাজ করতে হয় মানুষকে। দলবদ্ধ ভাবে কাজ করলে কাজ এগোয় বেশি। তাই সৃষ্টি হয়েছে সংগঠনের। এক প্রতিষ্ঠান নানান ব্যাপারে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল, স্বয়ংসম্পূর্ণ কেউই নয়। এইভাবে পারস্পরিক নির্ভরতার জটিল এক জাল সৃষ্টি হয়েছে আমাদের জীবন-যাত্রায়।

দলবদ্ধভাবে কাজ করতে হলে কর্মী যেমন চাই, তেমনি চাই পরিচালক। শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক যেমন চাই, তেমনি চাই সুপারভাইজার, কেরানী, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ম্যানেজার, জেনারেল ম্যানেজার, তার উপর ডিরেক্টর। সরকারী দপ্তরে পিওন যেমন চাই, তেমনি চাই এল. ডি. ক্লার্ক, ইউ. ডি. ক্লার্ক, সেকশন অফিসার, ডেপুটি সেক্রেটারী, সেক্রেটারী, চীফ সেক্রেটারী, ইত্যাদি। সেনাবাহিনীতে চাই সেপাই থেকে শুরু করে লেফটে-ন্যাণ্ট, ক্যাপ্টেন, মেজর, কর্নেল, ব্রিগেডিয়ার, জেনারেল, তার-পর ফিল্ড মার্শাল। সবখানেই দেখা যাচ্ছে সিঁড়ির মত ধাপ রয়েছে, তারতম্য রয়েছে পদমর্যাদার। এছাড়া কাজ চলতে পারে না। দলবদ্ধভাবে কাজ করতে হলে মানুষকে উপরওয়ালার নির্দেশ ও শাসন মেনে চলতেই হবে, অধস্তনদের নির্দেশ ও শাসনের মাধ্যমে চালাতেই হবে।

ধাপ রয়েছে বলেই শিশুকাল থেকে আমাদের বাড়িতে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে উৎসাহ দেয়া হয় নিজের ক্ষমতা ও দক্ষতা যতদূর সম্ভব বৃদ্ধি করে নিয়ে যতটা সম্ভব উঁচু ধাপে পৌঁছবার জন্যে। প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে দেয়া হয়, ভালমত শিখিয়ে দেয়া হয় কর্তৃত্ব, দায়িত্ব, আনুগত্য, প্রশংসা, দোষারোপ, শাস্তি, সফলতা, বিফলতা ইত্যাদি কাকে বলে। প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে চালাতে হলে এসবের প্রয়োজন সত্যিই আছে।

ছোটকাল থেকে আমাদের যেভাবে শিক্ষা দেয়া হয়েছে তাতে আমাদের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, আমাদের মূল্য নির্ভর করে

কর্মস্থলে শক্তি, কৌশল, জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কে কতটা দক্ষতা অর্জন ও প্রদর্শন করতে পারে তার ওপর। সহকর্মীদের মূল্যও আমরা এই যোগ্যতা বিচার করেই দিয়ে থাকি। ওপর-ওয়ালার সুনজর আকর্ষণের চেষ্টা করতে হবে আমাদের, মাথা পেতে নিতে হবে তার নির্দেশ এবং আজ্ঞা। ধমক-ধামক ও শাস্তি সহ্য করে নিতে হবে। শিখতে হবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, প্রতিযোগিতা। হতে হবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ডিঙাতে হবে ধাপের পর ধাপ। মনের মধ্যে বসে গিয়েছে আমাদের—মানুষ হিসেবে আমাদের মূল্য ও গুরুত্ব নির্ভর করছে কে কতটা সামাজিক পদমর্যাদা অর্জন করলাম, কাজে পারদর্শিতা অর্জন করলাম এবং আর্থিক নিরাপত্তা অর্জন করলাম তার ওপর। ফলে সমস্ত শক্তি ব্যয় করি আমরা এইসব অর্জন করবার পিছনে। কাজের জগৎ গ্রাস করে নেয় আমাদের সমস্ত সত্তাকে। ঐ জগতের রীতিনীতি এমনই আত্মস্থ করে ফেলি যে, ওটাকেই প্রয়োগ করতে চাই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে। একই নিয়ম খাটাতে চাই পারিবারিক বা সামাজিক জীবনে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ওপর, ভাইবোনের ওপর, এমন কি বন্ধু-বান্ধবের ওপরও। কর্মক্ষেত্রে ধাপের পর ধাপ ডিঙিয়ে উপরে উঠতে হলে যেটা একান্ত আবশ্যক, সেই প্রতিযোগিতামূলক আত্মকেন্দ্রিকতা প্রয়োগ করতে চাই আমরা ভালবাসার ক্ষেত্রে, বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে, আত্মিক নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি লাভের প্রচেষ্টায়।

ব্যাপারটা আরও একটু তলিয়ে দেখা যাক। দুটো জিনিস

প্রত্যেক মানুষেরই দরকার, যদি জীবনটা যাপনযোগ্য করে তুলতে হয়। এক, শারীরিক দিক থেকে ভাল থাকা। স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য আর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা এসে যাচ্ছে এরই মধ্যে। দুই, ভালবাসা, প্রশংসা, স্বীকৃতি ও বন্ধুত্ব লাভ : যাতে মানুষের সাথে একাত্ম হতে পারি, বুঝি যে আমার প্রয়োজন আছে আর সবার কাছে, মুক্তি পেতে পারি আত্মিক নিঃসঙ্গতা থেকে।

সবচেয়ে বড় যে ভুলটা আমরা করি, সেটা হচ্ছে, আমরা ধরেই নিই, প্রথমটা অর্জন করতে পারলে দ্বিতীয়টা এসে যাবে আপনিই, কান টানলে মাথা আসার মত। ছোটকাল থেকেই আমরা শিখেছি ক্ষমতা দিয়ে মানুষের মূল্য বিচার করতে, কাজেই যখনই দেখি যতটা আশা করছি, এক মা ছাড়া আর কারও কাছ থেকে ততটা ভালবাসা পাওয়া যায় না, তখন ধরে নিই এটা ঘটছে আমাদের নিজেদের দুর্বলতার জন্যে। মনে করি, সুখ-শান্তি, ভালবাসা, মর্যাদা আর প্রশংসা পেতে হলে আমাদের আরও ক্ষমতা অর্জন করতে হবে, নিজেদের যোগ্য প্রমাণ করতে হবে অর্থনৈতিক ও কলা-কৌশলগত দিক থেকে, নামতে হবে আরও তীব্র প্রতিযোগিতায়।

ফলটা দাঁড়ায় এই যে, নিজের মধ্যে নিজেকে সম্মান করবার কিছু আর খুঁজে পাই না আমরা, সর্বক্ষণ তুলনা করি নিজেদের অন্যের সাথে। সব সময় প্রমাণ করবার চেষ্টা করি যে আমরা অন্যদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান, বেশি ভাল। অথবা সব সময় অন্যদের সাথে তুলনায় নিজেদের দুর্বল, অক্ষম বা খারাপ দেখতে

পেয়ে মন খারাপ করি। এই দুটোই আমাদের জন্যে খারাপ। তুলনার জন্যে অসংখ্য দুর্বল মানুষ আছে ঠিকই, তেমনি আবার অসংখ্য সবল মানুষও রয়ে গেছে এবং থাকবে, যাদের তুলনায় নিজেদেরকে ছোট ভাবতে বাধ্য হবো আমরা।

যাই হোক, ধরে নেয়া যাক, অনেক ঘষেমেজে নিজেকে আমার আশ-পাশের আর সবার চেয়ে বেশি চকচকে করে ফেললাম, কারও কোন সন্দেহ নেই যে আমি আর সবার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান, কৌশলী, দক্ষ, অভিজ্ঞ। তবু ত আমার প্রেমে পাগল হয়ে উঠছে না সবাই। কেন?

কারণ আর কিছুই না, গোড়ায় গলদ। ভালবাসা পাওয়ার জন্যে নেমেছিলাম আমি প্রতিযোগিতায়, নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে আমি নিজেকে এবং আর সবাইকে দেখাতে চাইছি আমি সবার সম্মান ও বন্ধুত্ব পাওয়ার উপযুক্ত হয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই প্রমাণ করবার চেষ্টাই আমাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে সবার থেকে, আরও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে আমার অযোগ্যতা। আমি যে নিজেকে বড় মনে করছি, সেটা প্রকাশ পাচ্ছে আমার চাল-চলন, ব্যবহারে। যোগ্যতার দম্ভ নিয়ে আমি যারই কাছে যাচ্ছি তার মনে আমার প্রতি ঈর্ষা, ভয় অথবা ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই সৃষ্টি হচ্ছে না। যে লোক সর্বক্ষণ তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টায় ব্যস্ত, আর যাই হোক, তাকে ভালবাসার প্রশ্ন ওঠে না। বরং যে প্রতিনিয়ত আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করছে যে সে আমার চেয়ে বড়, আমার স্বাভাবিক

প্রতিযোগিতা করে প্রমাণ করবার চেষ্টা করা যে আসলে সে তা নয়।

আসল কথা, ক্ষমতা বা যোগ্যতা দেখে কেউ কাউকে ভালবাসে না। বন্ধুত্ব, ভালবাসা, এসব জিনিস ক্ষমতা-অক্ষমতা বা যোগ্যতা-অযোগ্যতার বাইরের ব্যাপার। দুর্বলতার ভয়, কিম্বা ক্ষমতার পিপাসা আমাদের আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে, সেই সাথে আল-গোছে চলে আসে তুলনা। আর তুলনা এসে গেলেই গেল নষ্ট হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত মানবিক আদান-প্রদান।

মানুষের সাথে সহজ সম্পর্ক স্থাপন করে নিজের নিঃসঙ্গতা দূর করতে হলে প্রথমেই দূর করতে হবে ভয়। যখন তুমি মানুষকে ভয় পাবে না, মানুষও তোমাকে ভয় পাবে না, কেবলমাত্র তখনই প্রস্তুত হবে বন্ধুত্বের ক্ষেত্র। সেখানে আদান-প্রদান হবে সমমর্যাদার ভিত্তিতে। তোমার ক্ষমতা বা গুণ জাহিরের প্রবণতা এসে গেলেই সেই তাপে পুড়ে যাবে খেতের সব শস্য।

আমাদের পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে, মানুষ হিসেবে নিজেদের মূল্য প্রমাণ করতে গিয়ে অন্যের তুলনায় নিজের দক্ষতা বা ক্ষমতা বৃদ্ধি করে কোন ফায়দা নেই। দুর্বলতা অসম্পূর্ণতা মানুষের জন্মের সঙ্গী। এজন্যে লজ্জিত হওয়ারও কিছুই নেই, বরং একে সহজভাবে স্বীকার করে নেয়াই ভাল। এই অসম্পূর্ণতাবোধই আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে ধরছে আলোর প্রদীপ। যতদিন মানুষের শরীরে প্রাণ আর মনের মধ্যে আশা থাকবে, ততদিন থাকবে এটা আমাদের সাথে। একে যদি ত্রুটি মনে করে নিজেকে ত্রুটিমুক্ত করবার প্রাণপণ চেষ্টা করি, অনর্থক ক্ষয় হবে জীবনী-শক্তি—

কোনদিন সম্মানজনক অবস্থায় পৌঁছতে পারব না, কোনদিন সন্তুষ্ট হতে পারব না, নিজের সম্পর্কে ধারণাটা দোদুল্যমান পেণ্ডুলামের মত দুলতে থাকবে বিরামহীন, একবার আত্মগর্ব, একবার আত্মগ্লানি, একবার আত্মপ্রশংসা, একবার অনুশোচনা—এইভাবে একবার এদিক একবার ওদিকে। একবার ভয় পাব মানুষকে, একবার ভয় দেখাব। সুখ হবে না।

এই অসম্পূর্ণতাবোধকে ভয় পায় বলেই নার্ভাস হয়ে পড়ে মানুষ, নিঃসঙ্গ মনে করে নিজেকে। নিঃসঙ্গতার বেদনা সহ্য করতে না পেরে নিজের ক্ষমতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধি করে মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করে—আমি দুর্বল নই, বন্ধুত্ব পাওয়ার যোগ্য। এই হামবড়াই ঈর্ষা, রাগ বা ঘৃণার সৃষ্টি করে মানুষের মনে। সেটা টের পেয়ে আরও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে নার্ভাস লোক, বেড়ে যায় ভয়। এইভাবে পড়ে যায় এক মহা ঘূর্ণিপাকে। আবার চেষ্টা চলে যোগ্যতা বৃদ্ধির।

কাজেই দৃষ্টিভঙ্গিটা একটু পরিবর্তন করে নিতে হবে আমাদের। কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতা বৃদ্ধি করে মর্যাদা অর্জন করে নিতে কুণ্ঠিত হব না। কিন্তু সেই প্রতিযোগিতা আর তুলনার মনোভাব কর্মক্ষেত্র থেকে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে টেনে আনব না। লাট-বেলাট হলেই বন্ধুত্ব পাওয়ার যোগ্যতা বর্তায় না কারও ওপর। আরেকজনকে ছোট করে তার কাছে প্রীতি আশা করা বাতুলতা।

ও জন্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ ধরতে হবে আমাদের। ভালবাসা

পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে ভালবাসা দেয়া। প্রশংসা পেতে চাইলে প্রশংসা করতেও শিখতে হবে। সম্মান চাইলে দিতে হবে সম্মান। যদি চাই সহানুভূতি, আমারও দেখাতে হবে সহানুভূতি। দোষে-গুণে যে যেমন, তাকে যদি বন্ধু বলে গ্রহণ করতে পারি, আমিও পাব তার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব।

এর চেয়ে শর্টকাট আর কোন রাস্তা নেই।

শৈশবের কুশিক্ষা

মনস্তত্ত্ববিদরা সবাই বলছেন, আমাদের বেশির ভাগ অমূলক ভয়ের জন্ম আমাদের শৈশবে। শৈশবের কুশিক্ষার ফলে দানা বাঁধে এসব। ধীরে ধীরে এমনভাবে মনের মধ্যে গেঁথে বসে যায়, মানসিক গঠনের সাথে এমনভাবে মিশে যায় যে এগুলোকে আর আলাদা করে চেনা যায় না সহজে।

আমরা বড় বেশি শাসন করি আমাদের শিশুকে। নিজেদের ধ্যান-ধারণা ঢুকাবার চেষ্টা করি তার মধ্যে, প্রয়োজন হলে বল প্রয়োগ করেও। বুঝি না, আসলে শিক্ষা দিচ্ছি না, কণ্ডিশনিং হচ্ছে—ওর মনের মধ্যে কিছু ভাব গেঁথে দিচ্ছি জোর করে; ওকে স্বাধীন হতে সাহায্য করছি না, দমিয়ে দিচ্ছি জবরদস্তি করে; ওর ভয় দূর করছি না, আরও শক্ত খুঁটি গেড়ে বসিয়ে দিচ্ছি ওর মনের ভিতর। ভেবেও দেখি না, শিক্ষা দেয়ার নামে বল প্রয়োগ আমাদের অযোগ্যতাই প্রমাণ করে।

একটা বাচ্চা ছেলেকে যখন সাইকেল চড়া বা সাঁতার শেখাই তখন আমরা কি করি? মোটামুটি কোন্ ভঙ্গিতে কি করতে হবে

বুঝিয়ে দিয়ে সাহায্য করি তাকে নিজের চেষ্টায় শিখে নিতে। একবারেই ঝপাৎ করে পানিতে ফেলে দিই না, কিম্বা সাইকেলে চড়িয়ে পড়ে পড়ুক বলে ছেড়ে দিই না তাকে—শাসনে রাখি। কতটুকু শাসন? পানিতে নেমে ওর পেটের নিচে একটা হাত দিয়ে বলি হাত-পা ছুঁড়ে চেষ্টা করো ভেসে থাকতে, সামনে এগিয়ে যেতে। সাইকেলের সীটে বসিয়ে ধরে রাখি সাইকেলটা পিছন থেকে, বলি চালাও, চেষ্টা করো ভারসাম্য বজায় রাখতে। খুশি মনে চেষ্টা করে ছেলেটা। বেশ কিছুটা জোর খাটাচ্ছি আমি, কিন্তু তাতে মোটেই অখুশি হচ্ছে না ছেলে, আমার কর্তৃ-ত্বের বিরুদ্ধে কোন রকম বিদ্রোহ দানা বাঁধছে না তার মনে, কারণ আমি যদি পেটের নিচে একটা হাত দিয়ে ওকে ভাসিয়ে না রাখতাম, কিম্বা সাইকেলটা যদি পিছন থেকে ধরে না রাখ-তাম, তাহলে পানির নিচে নাকানি-চুবানি খেতে হত ওকে, কিম্বা আছাড় খেয়ে ছড়ে যেত হাত পা। আমি যেমন জানি, ও-ও তেমনি জানে, যেটুকু বাধা সৃষ্টি করছি, সেটা করছি ওর ভালর জন্যেই। আমি জোর খাটাচ্ছি সাময়িকভাবে, শাসন করছি শাসনকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলবার জন্যেই। আমার সাথে একটা বোঝাপড়া রয়েছে শিক্ষার্থীর। ও জানে, আমার এই বল প্রয়োগ ওকে শাস্তি দেয়া, ভীতি প্রদর্শন বা দমিয়ে দেয়ার জন্যে নয়—ওকে স্বাধীনভাবে সাহসের সাথে প্রতিকূল অবস্থাকে আয়ত্ত করা শেখাচ্ছি আমি। ব্যাপারটা ঘটছে পার-স্পরিক সাহায্য, সমঝোতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে।

সব শিক্ষাই আসলে এই সাঁতার বা সাইকেল চালানো শেখার মত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় তা হয় না। শেখাতে গিয়ে আমরা এমনই শাসন করি, এমনই চাপ সৃষ্টি করি যে, শিক্ষার উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যায়—সাহসের সাথে স্বাধীনভাবে জীবনের চোখে চোখ রাখতে পারে না এরা বড় হয়ে, মাথা নিচু করে কুঁকড়ে থাকে নানান ভয় ভাবনায়। আমাদের পরিষ্কারভাবে বোঝা উচিত: 'দেয়ার ইজ নো ভাচু´ ইন এ প্রিপারেশন ফর লাইফ দ্যাট মেকস দা পিউপিল অ্যাফ্রেড টু লিভ ইট,' বলছেন আর্ণস্ট জোনস, এম. ডি।

বাপ-মার দুর্নাম করতে চাই না, তাঁরা প্রচলিত নিয়মই অনুসরণ করেছিলেন; কিন্তু সত্যের খাতিরে বলা উচিত, আমাদের বেশির ভাগেরই বাপ-মা শৈশবে আমাদের সঠিক শিক্ষা দিতে পারেননি। ওঁদের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে আমাদের। নিজেদের সন্তানকে শিক্ষা দেয়ার সময় খেয়াল রাখব: তাকে মানুষ হিসেবে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে, তার আত্মসম্মানকে কখনও খর্ব করলে চলবে না, তার প্রাইভেসিকে পদদলিত করা অপরাধ। স্মরণ রাখব দুটো জিনিস: এক, ওকে নিয়ন্ত্রণ করছি নিয়ন্ত্রণের বাইরে ঠেলে দেয়ার জন্যেই; দুই, এমনভাবে শিক্ষা দিচ্ছি যাতে ও ক্রমবর্ধমান হারে নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে সপারগ হয়।

এভাবে মানুষ না করলে হয় সে কর্তৃত্বের ভয়ে কেঁচো হয়ে যাবে, নিজেকে সবার মাড়াবার জন্যে পাপোশ বানিয়ে ফেলবে,

নয়ত বিদ্রোহের আগুনে জ্বলবে সারা জীবন। এ দুটোর কোন-টাই আমাদের জন্যে মঙ্গলজনক নয়। প্রথম ক্ষেত্রে সে হয়ে পড়-বে পরনির্ভরশীল, নিজের আত্মবিশ্বাস বলতে কিছুই থাকবে না, কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে—স্বাধীনতা ওর কাছে মনে হবে অসহ্য বোঝা। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সে জীবনটাকে এক মহাযুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করবে, সারা জীবন ঝগড়া বাধিয়ে রাখবে সবার সাথে—ঠিক হোক বা ভুল হোক কর্তৃপক্ষের বিরো-ধিতা করাই যেন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, স্বাধীনতা অর্জনের এক-মাত্র পথ।

এই দুই দলের কোন দলের কপালেই সুখ নেই। অতিরিক্ত কড়া শাসনে দমে গিয়ে যে নিজেকে অনুগত ভৃত্য বা পাপোশ বানিয়ে ফেলেছে তার সুখ নেই—সবাই মাড়িয়ে যাচ্ছে তাকে, অঙ্গুলিসংকেতে ওঠাচ্ছে বসাচ্ছে, পান থেকে চুন খসলে রাঙাচ্ছে চোখ। বিদ্রোহীর সুখ নেই—সর্বক্ষণ খিটির মিটির লাগিয়ে রাখছে সে সবার সাথে, কেউ কিছু বললে সাথে সাথেই তার দ্বিমত প্রকাশ করা চাই, বস্ যদি বলে এদিকে চল, সে যাবে ওদিকে। আদেশ মান্য করাকে সে মনে করে অসম্মান; ফলে কোথাও জায়গা নেই তার, ত্যক্ত হয়ে বের করে দিয়েছে তাকে সবাই দল থেকে। শৈশবে এরা আঘাত পেয়েছে বড়দের কাছ থেকে, জখম হয়েছে, শাস্তি পেয়েছে বেয়াড়াপনার, মনে মনে পুষে রেখেছে রাগ—দাঁড়াও, বড় হয়ে নিই, তারপর আমাকে বশে রাখো কি করে দেখে নেব। এই মনোভাবটাও আসছে কিন্তু কর্তৃত্বের ভয়

থেকেই। এরা জানে না, কেবল আক্রমণাত্মক হলেই বা আদেশ লঙ্ঘন করলেই শাসনের বেড়ি ভাঙা যায় না, গোড়ার ভয়টাকেই দূর করতে হবে আমাদের—এই ভয় থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারলেই কেবল নিজের বিবেচনায় যে আদেশ ভাল বা মন্দ বলে মনে হবে সেটাকে মান্য বা লঙ্ঘন করবার স্বাধীনতা অর্জন করতে পারব।

প্রভুত্ব কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণের ভয়—সেটা আক্রমণ বা আত্মসমর্পণ যেভাবেই প্রকাশ পাক না কেন—আমাদের স্নায়বিক দুর্বলতার একটা প্রধান কারণ। তাই এই ব্যাপারটা ভালমত তলিয়ে দেখে যত শীঘ্রি সম্ভব এর মূলোৎপাটন করে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ। ডক্টর পিটার ফ্লেচার চমৎকার এক পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর 'ইয়োর ইমোশনাল প্রব্লেম্‌স্' গ্রন্থে।

নিরিবিলি একটা ঘর বেছে নিন যেখানে পনের মিনিটের মধ্যে কেউ কোন রকম ব্যাঘাত ঘটাবে না। একটা চেয়ার, সোফা বা খাটে গা এলিয়ে দিয়ে আরাম করে বসুন বা শুয়ে পড়ুন। শরীরটা ঢিল করে দিলে মন থেকে উদ্বেগ, উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠা অনেকটা দূর হয়ে যাবে। এই অবস্থায় ছেলেবেলার কোন একটা ঘটনা মনে আনবার চেষ্টা করুন, যখন ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাপ-মা বা অন্য কোন গুরুজনের আদেশ অনুযায়ী কিছু একটা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বার কয়েক ঘটনাটা মনের মধ্যে ছায়াছবির মত ফুটিয়ে তুলুন। এতে ঐ ঘটনার ফলে মনের মধ্যে সে সময়ে যে ভাবাবেগের চাপ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল, এবং এখনও তার

যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে তা অনেকটা প্রশমিত হয়ে আসবে। শার বার ব্যাপারটা মনের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় বুঝে নিন সে সময়ে সেই অবস্থাটা কিভাবে মোকাবিলা করেছিলেন, ঠিক কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল আপনার মধ্যে।

ছোটবেলার সেই প্রতিক্রিয়ার ধরনটা পরিষ্কারভাবে বুঝে নিয়ে মিলিয়ে দেখুন নিজের বর্তমান স্ট্র্যাটেজির সাথে। একই পদ্ধতি ব্যবহার করছেন কি? এখন যে সব নিয়ন্ত্রণ, আদেশ বা কর্তৃত্বের সম্মুখীন হচ্ছেন, যেগুলো আপনার মনে ভীতি রাগ বা বিদ্রোহ জাগাচ্ছে, সেগুলোর কিভাবে মোকাবিলা করছেন? সেই ছেলেবেলার অপরিণত কৌশলেই? আপনার বর্তমান সমস্যার কতখানির জন্যে দায়ী করা যায় শৈশবের সেই অশুদ্ধ কৌশলের অকৃতকার্যতাকে? কিভাবে চললে ঠিক হবে? কোন্ পথটা গ্রহণ করবেন? সহজ যুক্তি কোন্ দিকে পথ নির্দেশ করছে?

একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, ছুনিয়ার সবাইকে পরিবর্তন করার চাইতে নিজেকে পরিবর্তন করে নেয়া অনেক সহজ।

জীবন যাপন

'সুখী হতে হলে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের চাই স্বাধীনতা, জীবনের লক্ষ স্থির করে নিয়ে সেই পথে সাফল্যের সাথে ধাপে ধাপে এগোন ; স্বাস্থ্য ঠিক রাখা ; মনের মত কাজ, কিংবা এমন কাজ যাতে সন্তুষ্টি লাভ করা যায় ; স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক জীবন, অবসরের জন্যে চিত্তাকর্ষক হবি ; আর অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য। নিরাপত্তাবোধও দরকার, কিন্তু সেটা নিজের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস এসে গেলে আপনিই আসবে।'—বলছেন ডক্টর এস হ্যারিসন।

কথাটা একটু ভাল ভাবে বুঝে নেয়া দরকার।

স্বাধীনতা বলতে ডক্টর হ্যারিসন বোঝাচ্ছেন নিজের জীবনটা নিজের পরিচালনাধীন রাখা। অর্থাৎ, আপনার জীবন চালাবেন আপনি নিজে, কাউকে এ ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করতে দেবেন না। নিজের প্রভু নিজেই। অন্যের ইমোশনাল ডমিনেশন থেকে মুক্ত রাখতে হবে আপনার নিজেকে। চিরকাল শিশু না থেকে বড় হতে হবে, যে-কোন ব্যাপারে নিজেই সিদ্ধান্ত নেয়ার যোগ্যতা

অর্জন করতে হবে। ছোট ছোট অসংখ্য অমূলক ভয় হাত-পা বেঁধে রেখেছে আপনার, সেগুলোকে চিনে বের করে নির্মূল করতে হবে। একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবেন আপনি নিজেই নিজের স্বাধীনতা খর্ব করছেন। এজন্যে বিদ্রোহ ঘোষণার দরকার নেই। যুদ্ধ করতে হলে করবেন, কিন্তু শান্ত মাথায়। আপনার উপর যে সব প্রভাব চাপানো হয়েছে, সহজ যুক্তি দিয়ে সেগু-লোকে কেটে চিরে বুঝে নিয়ে নামিয়ে দেবেন কাঁধ থেকে।

স্বাধীন হতে না পারলে জীবনের লক্ষ্য স্থির করা যায় না। অথচ লক্ষস্থির করে নেয়া অত্যন্ত জরুরী। প্রত্যেকটা মানুষই আমরা জীবন সমুদ্রে জাহাজ ভাসিয়েছি, চলছি ঘণ্টায় ষাট মিনিট বেগে, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই জানি না কোন্ বন্দরে পৌঁছতে চাই—গন্তব্যস্থল নেই, কাজেই ভেসে বেড়াচ্ছি লক্ষ-হীন ভাবে, পৌঁছতে পারছি না কোথাও। লক্ষস্থির করে নেয়া প্রত্যেক মানুষের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যথাযোগ্য গুরুত্বের সাথে এ-নিয়ে ভাবা উচিত। বুঝে নেয়া দরকার নিজের গভীরতম আকাঙ্ক্ষাটা কি, তারপর সেটাকে লক্ষ হিসেবে তুলে ধরতে হবে চোখের সামনে। হয়ত কোন দিনই সেই লক্ষে পৌঁছতে পারবেন না, কারণ আপনি যত এগোবেন লক্ষস্থল ততই দূরে সরবে, এটাই নিয়ম ; কিন্তু চলার পথে প্রচুর আনন্দ কুড়োবেন আপনি দুই হাতে। ধাপে ধাপে আসবে সাফল্য, সেই সাথে সুখ, সমৃদ্ধি।

স্বাস্থ্য বলতে শারীরিক ও মানসিক, দুটোই বুঝিয়েছেন হ্যারি-

সন সাহেব। শারীরিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হলে কি করতে হবে আপনি জানেন : খাওয়া, ব্যায়াম আর ঘুম ঠিক রাখলেই ঠিক থাকবে এটা। রোগ হলে সারিয়ে নিতে হবে উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে। বছরে একবার করে থরো মেডিকেল চেকাপ করাতে হবে। বদভ্যাস দমন করতে হবে, মোমবাতির দুইদিকেই আগুন ধরিয়ে দিয়ে পুড়ে নিঃশেষ হওয়ার কোন মানে হয় না। আর মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হলে আপনার এক বা একাধিক চিত্তাকর্ষক হবি থাকতে হবে, ক্ষতিকর ভাবাবেগগুলোর প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে নিজেকে, মানুষের সাথে আবদ্ধ হতে হবে সম্প্রীতির সম্পর্কে। মজাদার কোন কাজে মনটাকে ব্যস্ত রাখতে হবে। সেই কাজে কিছুটা সাফল্য এলেই মজা বেড়ে যাবে বহুগুণ। সেটা যদি একটা কাজের কাজ হয় তাহলে ত কথাই নেই, ডবল মজা। সেই সাথে দরকার ভাবাবেগের ভার-সাম্য। গ্লানি, অপমান, ঈর্ষা, ভীতি বা ঘৃণার স্মৃতি ঘাঁটলেই যে কেউ বুঝতে পারবে, এগুলোর প্রত্যেকটাই নেতিবাচক ভাবা-বেগ। ইতিবাচক ভাবাবেগ হচ্ছে আত্মবিশ্বাস, মানুষের প্রতি শুভেচ্ছা, ইত্যাদি। কেউ যদি সর্বক্ষণ উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ঘৃণা, ভয় ইত্যাদি নেতিবাচক ভাবাবেগে পীড়িত হয়, তার পক্ষে কিছুতেই সুখী হওয়া সম্ভব নয়। ভয় জিনিসটা মানুষের সৃষ্টিশীলতা নষ্ট করে দেয়। সমালোচনার ভয়, রোগ-বালাই নিয়ে দুশ্চিন্তা, দারিদ্র্য বা বেকারত্বের ভয় ইত্যাদি দূর করতে না পারলে বন্ধ হয়ে যাবে সৃষ্টিশীলতার চাকা। যেমন করে হোক তাড়াতে হবে এসব। কি

করে ? সাহসের সাথে রুখে দাঁড়িয়ে।

অহরহ চলছে নিজের মধ্যে শ্যাডো-বক্সিং। সচেতন থাকতে হবে--ছোট হোক, বড় হোক—প্রতিটা উদ্বেগ, প্রতিটা ভয়, প্রতিটা ঘৃণা মনের মধ্যে উঁকি দেয়ার সাথে সাথেই সেটাকে যুক্তিতর্কের সাহায্যে কেটে ছিঁড়ে বুঝে নিয়ে তার চোখে চোখ রাখলে মিলিয়ে যাবে সে-সব হাওয়ায়। জীবে দয়া, বিশেষ করে মানুষের প্রতি গভীর সম্প্রীতির ভাব না থাকলে মানুষ পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। অনেক গ্লানি, অনেক মালিন্য ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায় সহানুভূতির স্পর্শে। কারও বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে উপকারটা শুধু যে পাচ্ছে তারই একার হয় না, যে দিচ্ছে সে-ও পায়। যদিও অত্যন্ত জরুরী, এই মমতার ভাবটা সবার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে না। মমতা না পেলে মানুষের মনে মমতার জন্ম হওয়া কঠিন। তবে অতীত ঘেঁটে যদি কেউ বের করতে পারে কেন সে মানুষের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, এবং সেই অবস্থার স্বাভাবিকত্ব যদি স্বীকার করে নিতে পারে, তাহলে চেষ্টা করলে নিজের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব সে আনতে পারবে।

এবার আসছে মনের মত কাজ। যে-কাজে আগ্রহের অভাব থাকে, সেটাতে উদ্যম আসতেই পারে না। প্রাণ-প্রাচুর্যের জন্যে আগ্রহ হচ্ছে প্রধান পূর্বশর্ত। যে-লোকের জীবনে উদ্যম নেই, তার চলার গতি থেমে আসবে। নানান কাজে যে লোক মজা পাচ্ছে, কেবল সে-ই সত্যিকার সুখী। যে যত বেশি বিষয়ে

আগ্রহী, জীবন থেকে সে ঠিক ততই বেশি আনন্দ লুটে নিচ্ছে। অতএব, উপার্জনের জন্যে যে কাজ, সাংসারিক দায়-দায়িত্ব, সেসব যথাসম্ভব পালন করবার পরেও কিছুটা সময় নিজের মজার জন্যে আলাদা করে রাখা সবার জন্যেই দরকার। হবি নানান ধরনের হওয়াই ভাল, যাতে বয়সের সাথে সাথে স্বাভাবিক ভাবে কিছু কিছু ব্যাপারে উৎসাহ নিভে যাওয়ার পরেও শেষ জীবন পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে মজার কাজ থেকে যায় হাতে। তাছাড়াও যখনই একটা শখ মিটে যাচ্ছে, আরেকটা জোগাড় করে নেয়ার চেষ্টাও থাকা উচিত। কেবল মানসিক পরিশ্রমের হবিতে মগ্ন থাকলে একঘেয়েমি এসে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, তাই পাশাপাশি শারীরিক পরিশ্রমের হবিও থাকা দরকার।

হবির সবচেয়ে বড় উপকার হচ্ছে, এটা মানুষকে বাধ্য করে মানুষের কাছে যেতে। একই বিষয়ে আগ্রহী দুইজনের বন্ধুত্বে যে গভীরতা আসে, আর কিছুতে সেটা আনা সম্ভব নয়। হবির মাধ্যমেই সবচেয়ে সহজে একজন নিঃসঙ্গ লোক ঢুকে পড়তে পারে স্বাভাবিক সামাজিক জীবনপ্রবাহে, গড়ে নিতে পারে মানুষের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

যে-কোন বিষয়ে সাফল্য অর্জন করবার সহজ পথ হচ্ছে মনের মত কাজ বেছে নেয়া। এমন কাজ, যাতে নিজের গুণ প্রকাশ করবার সুযোগ রয়েছে, যে কাজের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে গর্ববোধ করতে পারে মানুষ। তাহলে কাজটা সে এতই ভাল করে করতে পারবে যে, সেই কাজের বিনিময়ে খাওয়া-পরার জন্যে যত-

টা দরকার তার চেয়ে অনেক বেশিই উপার্জন সম্ভব হবে তার পক্ষে।

নিরাপত্তাবোধ আসবে আত্মবিশ্বাস এসে গেলেই, আর আত্ম-বিশ্বাস আসবে নিজেকে অমূলক ভয় থেকে মুক্ত করতে পারলে। ভয় মানুষের সত্যিকার প্রাণপ্রাচুর্য ও কার্যক্ষমতা একেবারে শেষ করে দেয়। ভয়—শুধু ভয় কেন, যে কোন ভাবাবেগ—মানুষের স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি ঘোলা করে দেয়। একবার চেপে ধরলে যে কোন লোক বোকা হয়ে যেতে বাধ্য। সৃষ্টিশীলতা, উদ্যম, মৌলিকত্ব সব গায়েব হয়ে যাবে ভয়ের ঠেলায়। প্রাণহীন, যান্ত্রিক হয়ে পড়বে তার সব কাজ। এরচেয়ে খারাপ ইমোশন আর নেই। ছোট ছোট ভয় একেবারে ক্ষয় করে দিতে পারে একটা মানুষকে। কাজেই ভয়ের কবল থেকে বের করে আনতে হবে নিজেকে যেমন করে হোক। স্বকীয়তা নষ্ট করে দেয় ভয়ের প্রকোপ, মানুষকে বাধ্য করে পরমুখাপেক্ষী হতে। ভীত অবস্থায় মানুষ যে কাজ করে সে কাজের মান ক্রমেই খারাপের দিকে যেতে থাকে। এটা টের পেয়ে আরও ভয় পেয়ে যায় মানুষ—সমালোচনার ভয়, প্রত্যাখ্যানের ভয়, বরখাস্তের ভয়—যার ফলে আরও অবনতি হয় মানের। নিজের ক্ষমতার প্রতিই আস্থা হারিয়ে যায় তার, হারিয়ে যায় আত্মবিশ্বাস।

এইজন্যেই নিজেকে অমূলক ভয় থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া দরকার। ভয় বলতে যে কেবল ভূতের বা ডাকাতের ভয় বোঝায় না, সেটা বোঝা দরকার প্রথমে। ভয়

জিনিসটা এতই মজ্জাগত হয়ে গেছে আমাদের যে, আমরা বেশির ভাগ সময়ই যে ভয়ের কবলে থাকি সেটাই বুঝি না। প্রথমে নিজের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে বুঝে নিতে হবে ঠিক কিসে কিসে আমার ভয়। প্রতিটা ছোট ছোট ভয়কে পরিষ্কার ভাবে চিনে নিয়ে দূর করতে হবে একে একে। বেশির ভাগ ভয়েরই মূল খুঁজতে গেলে দেখা যাবে সেটা গাঁথা রয়েছে ছেলেবেলায়। প্রত্যেকটা ভয়কে আলাদা আলাদা ভাবে ধরে তার মূলে চলে যেতে হবে। ভাল করে বুঝে নিতে হবে ঠিক কি পরিমাণ অমূলক এইসব ভয়। যে কোন একটা ভয়কে ধরে মনের মধ্যে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করলে ধীরে ধীরে নিজের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, সত্যিই তেমন যুক্তি-যুক্ত কারণ নেই ভয় পাওয়ার। বার বার যদি মূলে গিয়ে বুঝতে পারি ভয়টা অমূলক, তাহলে দুর্বল হয়ে আসবে ভয়ের প্রকোপ। তখন তার বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালে দূর হয়ে যাবে সেটা। যখন বোঝা যায় অনর্থক ভয় পাচ্ছি, তখন আর ভয় থাকতে পারে না। বিফল হওয়ার ভয় আসে ছেলেবেলায় কোন কাজ কেউ নিন্দা বা নিরুৎসাহ করলে, সমালোচনার ভয় আসে কটু সমালোচনার পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে। কারণটা যাই হোক, ভয় দূর করতে হলে প্রথম কাজ হচ্ছে, নিজের কাছে খোলাখুলি স্বীকার করতে হবে যে অমুক ব্যাপারটায় ভয় পাই। তারপর সেটার মূল খুঁজতে হবে অতীতে, তারপর সেটাকে বার বার মনের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যতটা সম্ভব আবেগ মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে, যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে, ভয়টা আসলেই অমূলক।

তারপর রুখে দাঁড়াতে হবে ওটার বিরুদ্ধে। কথার ভয়, বাঁকা চাহনির ভয়, অত্যাচারের ভয়, সমালোচনার ভয়, উপেক্ষিত হওয়ার ভয়, বিফল হওয়ার ভয়, নতুনত্বের ভয়, ঝুঁকি নেয়ার ভয়—প্রত্যেকটা ভয়কে একে একে ঘাড় ধরে বের করে দিয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে আত্মবিশ্বাস। আর আত্মবিশ্বাস এসে গেলেই বুঝতে পারব স্থায়ী নিরাপত্তা বলে কোন বস্তু তুনিয়ায় নেই, নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাসী মানুষের মনের মধ্যে আপনিই জন্ম নেয় আশ্চর্য এক নিরাপত্তাবোধ—এটাকে বাদ দিয়ে সুখ ও সার্থকতা আসে না জীবনে।

নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, নিজের ইচ্ছেমত যখন কোন কাজ করেন, যতক্ষণ ওটার পেছনে লেগে আছেন, ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হন না আপনি কখনও। যেই বাধা পড়ল, অমনি শুরু হয়ে গেল ভাবাবেগ। অর্থাৎ, আপনার শক্তিকে যখন কোন একটা মনের মত কাজের মধ্যে প্রবাহিত করছেন, ঠিকই আছেন, যদি এমন কিছু ঘটে যার ফলে এই প্রবাহ ব্যাহত হয়, তাহলেই আপনার মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে ভাবাবেগ। কতখানি আপ্লুত হবেন সেটা নির্ভর করবে বাধাটা কতখানি জোরদার তার উপর। অল্প বাধায় অল্প ভাবাবেগ, কঠিন বাধায় প্লাবন শুরু হয়ে যেতে পারে।

ভাবাবেগ ব্যাপারটা যতটা না মানসিক তার চেয়ে অনেক বেশি কিন্তু শারীরিক। ভাবাবেগ সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথেই শরীরের ভিতর পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়ঃ ভয় পেলে বুকের ভিতর ধুকপুক বেড়ে যায়, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে, পাকস্থলীতে কেমন বিচিত্র এক অনুভূতি হয়। রেগে গেলে গা গরম হয়ে ওঠে, রক্তের সাথে অ্যাড্রেনালিন মিশে 'যুদ্ধংদেহী' ভাব সৃষ্টি হয়,

পেশীগুলো শক্ত হয়ে ওঠে আক্রমণের জন্যে, বেশি অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হয়। লজ্জা পেলে লাল হয়ে ওঠে গাল, গরম হয়ে ওঠে কান। ইমোশনটা কতখানি জোরালো সেটা বোঝা যায় শরীরের উপর কি পরিমাণ চাপ পড়ছে তা দেখে। এটার গুণাগুণ, অর্থাৎ ভাল লাগছে কি খারাপ লাগছে, সেটা নির্ভর করে আপনার মানসিকতার উপর, বাধাটাকে কিভাবে দেখছেন, তার উপর। একই বাধা একেক সময়ে বা পরিবেশে একেক রকমের ভাবাবেগের জন্ম দিতে পারে।

ব্যস্তসমস্ত হয়ে হয়ত ছুটেছেন লঞ্চ ধরবেন বলে, দেরি হয়ে গেলে লঞ্চ ফেল করবেন, এমনি সময়ে যদি কেউ রাস্তায় দাঁড় করিয়ে লম্বা গল্প ফাঁদতে চায়, নিঃসন্দেহে বিরক্তি বোধ করবেন, রাগ হবে। সে যদি বাধা দিয়ে জানায় আপনার ছেলেটা গাড়ি চাপা পড়েছে, সাথে সাথেই বাড়ির বা হাসপাতালের উদ্দেশে ছুটবেন আপনি উদ্বিগ্ন হৃদয়ে। যদি জানায় দশ হাজার টাকা ভর্তি ব্রিফকেসটা ভুলে ফেলে এসেছিলেন পান-বিড়ির দোকানে টুলের উপর, খুশিতে জড়িয়ে ধরবেন লোকটাকে। কিন্তু টাকা-টুকা কিচ্ছু না, খামোকা ভ্যাজর ভ্যাজর করে যদি ও আপনার লঞ্চটা ফেল করায়, ভয়ানক চটে যাবেন আপনি, ভদ্রতার খাতিরে হয়ত কিছু বলবেন না, মনে মনে ইচ্ছা হবে: দিই এক থাবড়া দিয়ে ব্যাটার নাকটা চ্যাপটা করে। কিন্তু পরদিন খবরের কাগজে যদি দেখেন 'আবার লঞ্চ দুর্ঘটনা।'—এবং জানতে পারেন যে আপনি যেটায় উঠতে যাচ্ছিলেন সেটাই যাত্রীসহ ডুবে গেছে মাঝ-নদীতে, এ-

দিকে সাঁতার জানেন না, তাহলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পাগ-লের মত শহরময় খুঁজে বেড়াবেন সেই বিরক্তিকর লোকটাকে ধন্যবাদ জানাবার জন্যে। তার মানে বাধাটাকে কখন আপনি কিভাবে দেখছেন তার উপর নির্ভর করছে বিরক্ত হবেন, না উদ্বিগ্ন হবেন, খুশি হবেন, না রেগে যাবেন। এসবের প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিন্তু শারীরিক চাপ অনুভব করছেন আপনি।

ডক্টর লেস্টার ডি ক্রো এবং ডক্টর অ্যালিস ক্রো তাঁদের লেখা 'মেণ্টাল হাইজিন' বইয়ে বলেছেন: ইমোশনস্ আর অ্যামাঙ ম্যান'স গ্রেটেস্ট অ্যাসেট্স্। অ্যান ইনডিভিজুয়াল ক্রেভস্ ইমো-শনাল এক্সপিরিয়েন্সেস্ অ্যাণ্ড হি ওয়ান্টস্ টু বি নিয়ার স্টিমিউলি দ্যাট অ্যারাউয হিম। তা ঠিক। ভাবাবেগের অভাব ঘটলে মানু-ষের জীবন আর যাপনযোগ্য থাকে না। কিন্তু তেমনি আবার এ জিনিসটার আতিশয্য ঘটলেও দুরূহ হয়ে পড়ে জীবন-যাপন। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে এর মত লাইয়াবিলিটিও আর নেই। কাজেই ব্যাপারটার গভীরে গিয়ে এটাকে ভালমত দেখে, শুনে, বুঝে নেয়া দরকার।

ভাবাবেগের আতিশয্য আমাদের উপলব্ধি ও বিচার-বুদ্ধি ঘোলা করে দেয়। আনন্দ-বেদনা, রাগ-ভয়, ভালবাসা-ঘৃণা কিম্বা সহানু-ভূতি ঈর্ষা আমাদের যতই গভীরভাবে আলোড়িত করে ততই আবছা হয়ে আসে অনুভব-ক্ষমতা, আমাদের ভিতরে বা আশে-পাশে ঠিক কি যে ঘটছে পরিষ্কার ভাবে ঠাহর করে উঠতে পারি না। বোধশক্তি এতই ক্ষীণ হয়ে আসে যে অনেক সময় ভুল হয়ে

যায় অবস্থাটার সঠিক ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করতে। ফলে নির্ভুল সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। ভাবাবেগের প্রভাবে আমাদের কাজ কর্মের মধ্যেও ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভ্রান্তি এসে যায়। এর প্রভাবে আমরা যা বলি বা করি তার বেশির ভাগই যতটা না অবস্থার মোকাবিলার জন্যে, তার চেয়ে অনেক বেশি শরীরের মধ্যে যে উত্তেজনার তীব্র চাপ সৃষ্টি হয়েছে, যেটুকু বাড়তি শক্তি তৈরি হয়েছে, সেটাকে বের করে দিয়ে ভারমুক্ত হওয়ার জরুরী প্রয়োজনে। অনেক সময় বুঝি যে ভুল করতে যাচ্ছি, তবু সামলাতে পারি না নিজেকে। কারণ অস্বস্তিকর শারীরিক চাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে গিয়ে সেই সময়ে ঝোঁকের বশে উগ্র নাটকীয় কিছু করে বসবার দুর্বার একটা প্রবণতা আসে আমাদের মধ্যে, যুক্তিতর্ক, বিচার বিবেচনার ধার খুব একটা ধারতে চাই না। ফলে যা করা উচিত ছিল সেটা না করে বরং তার উল্টো কিছুই করে বসি।

ঠিক হোক আর ভুল হোক, কিছু একটা করে বসলে অনেকখানি প্রশমিত হয়ে যায় শারীরিক উত্তেজনা। এটা তাও ভাল। সবচেয়ে ক্ষতিকর হচ্ছে মনের মধ্যে ভাবাবেগগুলোকে পুষে রেখে বা দমিয়ে রেখে নিজের ভিতর শাঁখের করাত চালু করে দেয়া। ইমোশনাল কনফ্লিক্ট খুবই খারাপ জিনিস—বিবাদ, সেজন্যেই খারাপ তা নয়, খারাপ এইজন্যে যে বিবাদটা বাধছে ভুল জায়গায়; যুদ্ধ, সেজন্যেই খারাপ তা নয়, খারাপ এইজন্যে যে এটা গৃহযুদ্ধ।

বাস্তব জীবনে পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে হয় আমাদের।

যখনই বাইরের কোন বাধা এসে মানুষকে চ্যালেঞ্জ করে তখন তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, তার সাথে পাঞ্জা ধরে তাকে পরাজিত করে নিজের অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনতার পরিধি বাড়িয়ে নেয়া। বাধার সম্মুখীন হলেই মানু-ষের ভিতরের প্রাণশক্তি আত্মপ্রকাশ করছে আগ্রহ, উৎসাহ, উদ্যম, উত্তেজনা, ইত্যাদির মাধ্যমে। হয়ত সমাধান করতে হবে কোন বিশেষ সমাস্যার, হয়ত ঝুঁকি নিতে হবে বিশেষ কোন ব্যাপারে, হয়ত ভেদ করতে হবে কোন রহস্য। এসবই কিন্তু ডাকছে আমাদের কাজের দিকে। কাজে যখন ঝাঁপিয়ে পড়ছি তখন ব্যাপারটা খুব একটা নিরাপদ বা আরামপ্রদ হচ্ছে না। যখনই আমরা কোন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করছি, কাজটা আমাদের জন্যে হচ্ছে কম-বেশি বিপদজনক, কিছুটা কষ্টেরও। পরাজয়ের সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। কিন্তু তবু বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ছে মানুষ এই যুদ্ধে। কারণ, এটা শ্যাডো-বক্সিং নয়, সত্যিকার যুদ্ধ। যুদ্ধ করছি আমার বাইরের কোন বস্তু, ভাব বা অবস্থার সাথে। ভাবাবেগ থেকে আমাকে মুক্তি দিচ্ছে না এ যুদ্ধ, কিন্তু যেহেতু এটা গৃহযুদ্ধ নয়, বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে সত্যিকার যুদ্ধ—হারি বা জিতি, ইমোশনাল কনফ্লিক্ট সৃষ্টি হচ্ছে না আমার মধ্যে।

তাহলে কখন হচ্ছে ?

যে-মুহূর্তে আমি বাধা-বিঘ্নকে ভয় পেতে শুরু করছি, তাকে মহা পরাক্রমশালী এবং বিপদজনক জেনে রণে ভঙ্গ দিচ্ছি, ঠিক

সেই মুহূর্তেই শুরু হয়ে যাচ্ছে ভাবাবেগের অন্তর্দ্বন্দ্ব। বাধা অতিক্রম করবার চেষ্টা না করে প্রথমেই খুঁজছি নিরাপদ আশ্রয়, কৃত্রিম শান্তি খুঁজছি যুদ্ধ এড়িয়ে গিয়ে। বাইরের জগতের ডাকে সাড়া না দিয়ে বেছে নিচ্ছি নির্জীব, নিষ্ক্রিয় ভূমিকা। ফলে জীবন থেকে বাদ পড়ছে আনন্দ, উত্তেজনা, কৌতূহল, বৈচিত্র্য, রোমাঞ্চ —মোটকথা, বেঁচে যে আছি সেই অনুভূতিই। এমন এক পর্যায়ে চলে আসছি, যখন আসল বাধাটাকে শত্রু বলে ভাবছি না, শত্রু ঠাউরে নিচ্ছি নিজের ভিতরের উদ্দীপনাকে। চেষ্টা করছি এটাকেই কোনমতে চেপে দমিয়ে দিতে। কোন একটা চ্যালেঞ্জ সামনে এলেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রাণপ্রাচুর্য এসে যাচ্ছে মানুষের মধ্যে, সৃষ্টি হচ্ছে তীব্র ভাবাবেগের, ধরে নিচ্ছি, এটাকে দমন করতে পারলেই বুঝি ফিরে আসবে শান্তি। নিজের ভিতর তৈরি হচ্ছে ক্ষতিকর পরস্পরবিরোধী শক্তি। নিজের ভিতর যে পরাজিত, কর্মবিমুখ, অনুগত ভৃত্য রয়েছে সে চাইছে দুর্বার প্রাণচাঞ্চল্যকে শিকল পরিয়ে বশে রাখতে। যেটাকে সাধারণ ভাবে আমরা সেল্‌ফ কণ্ট্রোল বা আত্ম-শাসন বলি সেই শৃঙ্খল দিয়ে বেঁধে নতি স্বীকার করাতে চাইছি আমরা আমাদের স্বাভাবিক উৎসাহ, উদ্দীপনাকে।

এটা করতে গিয়ে প্রথমেই আমাদের সমস্ত আগ্রহ ও মনোযোগ আমরা বাইরের আসল দ্বন্দ্বের থেকে সরিয়ে নিয়ে আসছি অন্তর্দ্বন্দ্বের দিকে। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের প্রাণশক্তিকে ভাগ করে ফেলছি তিনটে আলাদা, পরস্পরবিরোধী শক্তিতে। ভয়ে কাবু

হয়ে যাওয়া 'আমি' চেষ্টা করছি বাইরের জগতের বাধার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত 'আমি'-কে বশে আনতে--নিজেরই এক হাতের সাথে জোর পাঞ্জার লড়াই চলেছে যেন নিজেরই অপর হাতের। যে সামান্য শক্তি অবশিষ্ট থাকছে তাই নিয়েই দুর্বল-ভাবে মোকাবিলা করতে হচ্ছে আমার বাইরের বিরুদ্ধতার—কারণ, আমি চোখ বুজে থাকলেই ত আর সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে না, আমাকে অতিক্রম করতেই হচ্ছে ছোটখাট নানান ধরনের বাধা-বিঘ্ন।

এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে দূর করতে হলে আমাদের পরিষ্কার ভাবে জানতে হবে ঠিক কোন্ কারণে কি করছি। কারণগুলোর বেশির-ভাগই রয়েছে আমাদের অবচেতন মনে—যেখানে ইচ্ছে করলেই চট করে হাত দিতে পারছি না আমরা। সাইকো-এনালিসি-সের মাধ্যমে চেষ্টা করলে হয়ত মূল কারণে পৌঁছানো সম্ভব হতে পারে। কিন্তু মনের কোন্ গোপন কন্দরে কি ঘটছে, অতসব ঘাঁটাঘাঁটি না করে বর্তমান চেতন মনে কি ঘটছে সেটা মনো-যোগের সাথে লক্ষ করলেও অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ অনেকখানি বুঝে নেয়া সম্ভব হতে পারে আমাদের পক্ষে। যখনই কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি, তখনই ঠিক কিভাবে সেটার মোকাবিলা করছি যদি সঠিকভাবে বুঝতে পারি, তাহলে নিজের কাছেই পরিষ্কার হয়ে যাবে ঠিক কোন্খানটায় নিজের বিরুদ্ধে শক্তি ব্যয় করছি নিজেরই। যখনই কিছু একটা করবার আগ্রহ বা ইচ্ছেকে দমন করে দিচ্ছি, তক্ষুণি খপ্ করে ধরতে হবে নিজেকে—প্রশ্ন তুলতে

হবে, কেন চেপে দিচ্ছি নিজেকে, কি লাভ এতে? নিজেকে দমিয়ে দিয়ে যে কৃত্রিম শান্তি অর্জন হচ্ছে, তার বিনিময়ে আসলে কতটা মূল্য দিতে হচ্ছে আমার? বারবার যদি তুলে ধরি এই প্রশ্ন, ভাল-মত বিশ্লেষণ করে দেখি প্রশ্নের উত্তরগুলো, তাহলে ধীরে ধীরে নিজের কাছেই পরিষ্কার হয়ে আসবে আত্মবঞ্চনা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সঠিক স্বরূপ; পরিষ্কার বুঝতে পারব কিসের জন্যে এত ঝগড়া-ঝাটি, এত তর্ক-বিতর্ক।

আর এটা বুঝতে পারলেই গোলমাল মিটিয়ে থামাতে পারব গৃহযুদ্ধ, নিজের শক্তি নিজের বিরুদ্ধে ক্ষয় করা থেকে বিরত হয়ে সমস্ত শক্তি একত্রিত করে প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব বাধা-বিঘ্নের বিরুদ্ধে। নিজেকে করে তুলতে পারব ক্ষুরধার এক ঝকঝকে তরবারি।

জয় বা পরাজয় আসলে ততটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়—যুদ্ধই জীবন।

সমস্যায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন, কিছুতেই সমাধান বের করা যাচ্ছে না। হঠাৎ কেউ বলে দিল আপনাকে উত্তরটা, আপনি অবাক হয়ে গেলেন—হায় হায়, এটা ত পানির মত সহজ, এছাড়া আর কিছু ত হতেই পারে না, একেবারে লাগসই সমাধান। এবং সহজ। হয়েছে না এরকম আপনার জীবনে বহুবার? সমাধান পেয়ে গেলে প্রত্যেকটা সমস্যাকে অত্যন্ত সহজ মনে হয়েছে না আপনার কাছে? কিন্তু যতক্ষণ না সমাধান পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ সমস্যাটাকে মনে হয় দুর্ভেদ্য এক বিশাল প্রাচীরের মত। তাই না?

আরেকজনের মাথায় এল, অথচ আপনার মাথায় এল না কেন এই সহজ উত্তরটা? কি ভুল হয়েছিল আপনার? কিম্বা কিসের অভাব আছে আপনার মধ্যে? কিভাবে চিন্তাশক্তি বাড়ান যায়?

এ নিয়ে মনস্তত্ত্ববিদেরা গবেষণা করেছেন অনেক। সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে মানুষের চিন্তা কোন্ পথে কিভাবে এগোয়

সেটা ভালমত বুঝবার জন্যে তাঁরা মানুষ ও ইতর প্রাণীর উপর অসংখ্য পরীক্ষা চালিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ইঁদুরকে গোলক-ধাঁধার বাক্সে ছেড়ে দিয়ে লক্ষ করেছেন, শিম্পাঞ্জীর খাঁচায় ছড়ি এবং নাগালের বাইরে কলা রেখে লক্ষ করেছেন তার চিন্তার গতিধারা, লক্ষ করেছেন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কয়েকটা রঙ-হীন তরল পদার্থ মিশিয়ে হলুদ রঙ তৈরি করার ফরমুলা কিভাবে আবিষ্কার করে। ল্যাবরেটরীতে পাওয়া এইসব তথ্যের সাথে মানুষের বাস্তব জীবনে সমস্যা সমাধানের একটা যোগসূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। দেখা গেছে আসলে সমস্যা বা তার সমাধান কঠিন কিছুই না, তথ্যগুলোকে ঠিকমত ব্যবহার করতে বা সাজাতে না পারলেই যে কোন সমস্যা পর্বত বলে মনে হয়।

ব্রিজের নিচে আটকে যাওয়া ট্রাকটার কথাই ধরা যাক। ওভার-হেড ব্রিজ, নিচ দিয়ে রাস্তা। একটা ট্রাক সেই রাস্তা দিয়ে যেতে চায়, কিন্তু ঠেকে যাচ্ছে অল্পের জন্যে। কি করে এখন ট্রাক পার করা যায়? নানান জনে নানান মত দিল, কিন্তু তাতে হয় ট্রাকের মাথা কাটতে হয়, নয়ত ব্রিজের নিচের কিছুটা অংশ ভাঙতে হয়। বড় বড় মাথা ঘামছে, কিন্তু সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না। এমন সময় বাচ্চা একটা ছেলে সহজ এক সমাধান দিল। সে বলল, গাড়ির চাকাগুলো থেকে খানিকটা করে হাওয়া ছেড়ে দাও। তাহলেই নিচু হয়ে যাবে গাড়িটা। সত্যিই ত। ঠিক সমাধানটা পাওয়া যেতেই সবাই অবাক হয়ে ভাবল, এই সহজ কথা-টা আমার মাথায় এল না কেন? এ ত জলের মত পরিষ্কার।

সমাধানের জন্যে প্রয়োজনীয় সব তথ্য হাতে থাকতেও মানুষ সেগুলোকে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারে না কেন? এর উত্তর হচ্ছে কমপিউটারের মতই মানুষের মস্তিষ্কের দুটো ভাগ আছে— তথ্য জমা রাখার ইউনিট এবং বিচার বিশ্লেষণ করার ইউনিট। জমা রাখার ইউনিটে অসংখ্য তথ্য জমা রাখা সম্ভব, কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণী ইউনিটের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সাধারণ মানুষ একবারে সাতটার বেশি তথ্য নিয়ে নাড়াচাড়া বা বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে না। কিন্তু বেশির ভাগ সমস্যা সমাধানের জন্যে সাতটার বেশি তথ্য বিচার করতে হয়। কাজেই কোন কোন তথ্য অথবা কোন এক বা একাধিক দিক সম্পূর্ণ বাদ পড়ে যায়।

এছাড়াও আরেকটি ব্যাপার হতে পারে। সমাধান খুঁজতে গিয়ে ভুল পথে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা আছে। একবার ভুলপথে চিন্তা শুরু করে কিছুদূর এগিয়ে গেলে আবার ঠিক পথে ফিরে আসা খুবই মুশকিল হয়ে পড়ে। ট্রাকটার কথায় আবার আসা যাক। সমস্যাটা ট্রাকের উপরের অংশে, কাজেই সবার মনোযোগ গিয়ে পড়ছে উপরের অংশে, মাথা ঘামাচ্ছে সবাই উপরের অংশ-টা নিয়েই। এবং ওখানেই আটকে যাচ্ছে। অন্য কোন দিক থেকে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে একথা মাথায় আসছে না আর।

আসলে ঠিক কোন্ পথে এগোন উচিত আগে থেকে জানা যায় না বলেই সমস্যার সমাধান কঠিন হয়ে পড়ে। বিভিন্ন দিক থেকে সমস্যাটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলে ঠিক পথটা পেয়ে যাওয়ার

সম্ভাবনা থাকে।

পর পর ছয়টা নিয়মের কথা বলব। এগুলো অনুসরণ করলে অসংখ্য সমস্যার সমাধান করতে পারবেন আপনি নিজেই। প্রথম তিনটি আপনাকে রক্ষা করবে ভুল চিন্তাধারা অনুসরণ করে আটকে যাওয়া থেকে, পরের তিনটি সাহায্য করবে যদি আটকে যান তাহলে সেখান থেকে বের হয়ে আসতে।

যেসব তথ্যের উপর ভিত্তি করে সমস্যার সমাধান করবেন বা সিদ্ধান্ত নেবেন সেগুলোর উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে যান কয়েকবার। সমস্যার বিভিন্ন দিকগুলোকে দ্রুত বার কয়েক ছুঁয়ে গেলে একটা সামগ্রিক রূপ ফুটে উঠবে ধীরে ধীরে। প্রতিটা দিক বিচার-বিশ্লেষণ ও যাচাই করে দেখার আগে সমস্যার একটা সামগ্রিক রূপ চোখের সামনে থাকা ভাল। সপ্তম শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক ডেকার্টে তাঁর Rule's for the Direction of the Mind-এ বলেছেন : ক-এর সাথে খ-এর কি সম্পর্ক, খ-এর সাথে গ-এর কি সম্পর্ক এবং গ-এর সাথে ঘ-এর কি সম্পর্ক জানা থাকলেই ক-এর সাথে ঘ-এর কি সম্পর্ক আমি বুঝতে পারি না—যদি না সবগুলো তথ্য আমি একসাথে মনে আনতে পারি। এজন্যে আমি সবগুলো তথ্যের উপর বার বার দ্রুত চোখ বুলিয়ে যাই, চিন্তাটাকে কোন একটা তথ্যের উপর আটকে না রেখে সবগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে থাকি ক্রমাগত। কিছুক্ষণ পর এমন একটা সময়

আসে যখন প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের সম্পর্ক ফুটে ওঠে আমার মনের পর্দায় একসাথে, এবং তখন ক ও ঘ-এর সম্পর্ক আমার কাছে ধরা পড়ে অতি সহজে।

অর্থাৎ সমস্যাটাকে সবদিক থেকে ঘরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিতে হবে প্রথমে।

দুই

সঠিক সূত্র সম্পর্কে চট্ করে কোন সিদ্ধান্তে আসবেন না। সমস্যার সাথে একটু পরিচয় হলেই প্রায়ই চট্ করে একটা না একটা সূত্র পাওয়া যায় এগিয়ে যাওয়ার জন্যে। যদি সেই সূত্রটাকেই সমাধানের পথ হিসেবে ধরে নিয়ে চিন্তা শুরু করেন তাহলে ভুল পথে আটকা পড়ার সম্ভাবনা আছে। একবার ভুল পথে অগ্রসর হলে ঠিক পথে ফেরত আসা খুবই কঠিন।

মনস্তত্ত্ববিদ জেরোম এস. ব্রুনার ও ম্যারি সি. পটার এর উপর চমৎকার একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। কোন একটা অতি পরিচিত জিনিসের ছবি আবছা ভাবে (out of focus) পর্দার উপর ফেলে দর্শকদের বলা হয়েছিল জিনিসটা কি সে সম্পর্কে একটা ধারণা করতে। কয়েক ধাপে ছবিটাকে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলা হল পর্দার উপর, এবং প্রতিবারই দর্শকদের মতামত চাওয়া হল। দেখা গেল, যারা একবার ভুল আন্দাজ করেছে, ছবিটা প্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠলেও তারা চিনতে পারছে না পরিচিত বস্তুটা। তাদের চিন্তাধারা আটকে গেছে অন্যখানে। অন্য আরেক-

জন দর্শক দ্বিধাহীন চিত্তে সঠিক উত্তর দিচ্ছে, কিন্তু ভুল চিন্তাধারায় আটকে যাওয়া ব্যক্তি কিছুতেই বুঝতে পারছে না। এর মানে, জলজ্যান্ত সত্য প্রতিষ্ঠা করা সহজ, কিন্তু যে ভুল পথে ভাবছে তাকে সত্য পথ দেখান কঠিন। এক লাফে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলে অন্যান্য সম্ভাব্য উত্তর চোখে পড়ে না মানুষের।

তিন

সমস্যার বিভিন্ন অংশগুলোকে উল্টেপাল্টে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাজিয়ে নিন। সাজানোর দোষে অনেক সময় ঠিক চিন্তাধারাটা চোখ এড়িয়ে যায়, কিম্বা কঠিন মনে হয় সমস্যাকে। ধরুন, আপনাকে দুটো কথা বলা হলঃ কামাল কুদ্দুসের চেয়ে ছোট, এবং কামাল নঈমের চেয়ে বড়। এখন জিজ্ঞেস করা হল, বলুন দেখি কুদ্দুস নঈমের চেয়ে ছোট, না বড়? বেশ কিছুটা কঠিন লাগছে না? চেষ্টা করে দেখুন। কিন্তু এই তথ্যগুলোকেই যদি অন্যভাবে সাজিয়ে নেয়া যায় তাহলে অনেক সহজ হয়ে যাবে। যদি বলি, কুদ্দুস কামালের চেয়ে বড় এবং কামাল নঈমের চেয়ে বড়, বলুন দেখি কুদ্দুস নঈমের চেয়ে বড়, না ছোট? সহজ হয়ে গেল না সমস্যাটা? সাজানোর দোষে কষ্ট পাচ্ছিলেন শুধু শুধু।

একটা খাঁচায় বন্দী শিম্পাঞ্জীর সামনে নাগালের বাইরে কলা এবং পিছনে নাগালের মধ্যেই একটা ছড়ি এমন ভাবে রাখা হল যাতে কলার দিকে চাইলে ছড়িটা সে দেখতে না পায়, ছড়ির দিকে চাইলে কলাটা দেখতে না পায়। দুটো জিনিসই দেখল

শিম্পাঞ্জীটা আলাদা আলাদা ভাবে, কিন্তু তাদের সম্পর্কটা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। বেশ খানিকক্ষণ পর ছড়িটা নিয়ে খেলতে খেলতে হঠাৎ ওর দৃষ্টি পথে ছড়ি ও কলা একসাথে পড়ল। মুহূর্তে দুটোর সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে উঠল শিম্পাঞ্জীর কাছে, ছড়ি ব্যবহার করে কলাটাকে কাছে টেনে এনে··· ইত্যাদি ইত্যাদি।

কাজেই তথ্যগুলো এবং সমস্যার অংশগুলো উল্টেপাল্টে নতুন করে সাজিয়ে দেখুন সমাধান সহজ হয় কিনা।

চার

যখন দেখবেন কোন খেই পাওয়া যাচ্ছে না, নতুন কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শুরু করুন আবার।

সমস্যাটিকে কিভাবে দেখছেন তার উপর নির্ভর করবে কোন্ পথে কি ধরনের সমাধান খুঁজবেন। ডক্টর মেয়ার সুন্দর একটা গবেষণা করেছিলেন এ ব্যাপারে। ঘরের ভিতর ছাতের দুই জায়গা থেকে দুটো অসমান দড়ি ঝুলান আছে। দড়ি দুটোর শেষ মাথা একত্র গিঁট দিতে হবে। কিন্তু দড়ি দুটো এমনভাবে ঝুলান আছে যে একটা ধরলে আরেকটা হাতের নাগালে পাওয়া যায় না।

একজন 'নাগালে পাওয়া'কে সমস্যা হিসেবে দেখল। ওর চিন্তা গেল একটা ছড়ি সংগ্রহের দিকে। একটা ছড়ি বা ঐ জাতীয় কিছু পেলে সে দড়ির মাথাটাকে একসাথে আনতে পারবে আরেকজন 'দড়ির দৈর্ঘ্য'কেই মনে করল আসল সমস্যা, সে

খুঁজছে আরেক টুকরো দড়ি। যে কোন একটা ঝুলানো দড়ির সাথে আর খানিকটা দড়ি বেঁধে লম্বা করে নিলে দুটোকে এক-সাথে আনা যাবে। কিন্তু ঘরে ছড়িও নেই, টুকরো দড়িও নেই।

তৃতীয়জন, 'যে কোন একটা দড়ি কাছে আনা'কে মূল সমস্যা হিসেবে ধরল। কিভাবে কাছে আনা যায়? লম্বা দড়িটার মাথায় যদি একটা চাবির গোছা বা কিছু বেঁধে দোল দেয়া যায় তাহলে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দোল খাবে দড়িটা, কাছে এলেই খপ্ করে ধরে ওটাকে বেঁধে ফেলা যাবে ছোট দড়িটার সাথে।

যখনই দেখছেন এগোবার পথ পাওয়া যাচ্ছে না সমস্যাটাকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার চেষ্টা করুন। এক দিকে একঘেয়ে ভাবে চেষ্টা না চালিয়ে নানান দিক থেকে চেষ্টা করুন যতক্ষণ না সন্তোষজনক সমাধান পাওয়া যাচ্ছে।

পাঁচ

যখন আটকে গেছেন, মাথাটা আর চলতে চাইছে না, দূরে সরে যান সমস্যা থেকে। বন্ধ রাখুন ওর পিছনে চিন্তা-ভাবনা। এতে নিশ্চিতভাবে ফল পাওয়া যায়। উপযুক্ত সময়ের উপর নির্ভর করে অনেক কিছু। অনেক সময়ে চোখের সামনেই জাজ্বল্যমান থাকে সঠিক উত্তরটা, কিন্তু চোখে পড়ে না, সামঞ্জস্যটা উপলব্ধি করা যায় না। দূরে সরে গেলে হঠাৎ চোখে পড়ে যায়। কিন্তু এজন্যে সব দিক থেকে আগে সর্বপ্রকার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত দেখে ছাড়তে হবে। ভালমত চেষ্টা না করেই বেহুদা সমস্যা

থেকে দূরে পালিয়ে গেলে লাভ হবে না।

ছয়

সমস্যাটা নিয়ে অন্যের সাথে আলাপ করুন। কাউকে কিছু বোঝাতে গেলে নিজে আগে বুঝতে হবে আপনাকে বাধ্য হয়েই। তর্কের খাতিরে অনেক ছোটখাট তথ্য, যা আপনি ততটা গুরুত্ব দিয়ে ভাবেননি, আপনাকে আবার যাচাই করে দেখতে হবে। তাছাড়া শ্রোতার প্রতিক্রিয়া এবং দুই একটা মন্তব্যে নতুন দিগন্ত খুলে যেতে পারে। কোন এক মনীষী বলতেন: যখন আমি কোন কিছু পরিষ্কারভাবে বুঝতে চাই, প্রথমে লিখে ফেলি সেটা কাগজে, তারপর আমার বন্ধুকে বোঝাই, তারপর বিপক্ষে তর্ক করার জন্যে শাণিত যুক্তি খাড়া করে নিয়ে তাকে বলি আমাকে বোঝাও, সবশেষে আমি বুঝি যে বুঝতে পেরেছি আমি ব্যাপার-টা। কাজেই আলাপ করুন।

এই ছ'টি নিয়ম অনুসরণ করলে আপনার সমস্যার সহজেই সমা-ধান পাবেন। আসলে এত কথার সারমর্ম হচ্ছে দুটো: দেখে চলুন, এবং আটকে গেলে অন্যপথ খুঁজুন। মনে রাখবেন, গায়ের জোরে সমাধান পাওয়া যায় না। কাজেই মনটা খোলা রাখুন, একই পথে বারবার অসফল প্রচেষ্টা না চালিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করুন।

কর্মক্ষমতা

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের অধিবাসী আমরা সবাই জানি এক মহা সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমরা। এই সংকট কাটিয়ে না উঠতে পারলে ধুলায় মিশে যাব। সারা দুনিয়া হাসবে আমাদের অক্ষমতা দেখে। মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না বাঙালী।

আমরা এ-ও জানি, দুর্যোগ কাটিয়ে উঠে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হলে কাজ করতে হবে আমাদের। যার যা ক্ষমতা তাই প্রয়োগ করতে হবে, ভূতের মত খাটতে হবে। যেমন করে হোক মাথা উঁচু করে দাঁড়াতেই হবে আমাদের পৃথিবীর বুকে। রাজনৈতিক নেতারা বক্তৃতা দিয়েছেন, উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন আমাদের প্রচুর কাজ করবার জন্যে, কিন্তু তাঁদের সবটুকু নির্ভরতা আমাদেরই উপর। নেতারা নিজ হাতে কাজ করলে কতটুকু কাজ হবে? যাদুমন্ত্র বলে যে তাঁরা দেশের অবস্থা রাতারাতি ভাল করেদেবেন, এমনও সম্ভব নয়। আসলে কাজ করে দেশের অবস্থার উন্নতি করার ভার আমার-আপনার মত সাধারণ মানু-

ষের। আমরা যদি সচেতন ভাবে যে যার দায়িত্ব পালন করি তাহলেই দেশের সত্যিকার মঙ্গল। দেশের মঙ্গলের উপরই নির্ভর করছে আমার-আপনার ব্যক্তিগত মঙ্গল।

আসুন, দেখা যাক কি ভাবে নিজের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়।

সাতটি নিয়ম অনুসরণ করতে বলেন জ্ঞানী-গুণীরা। এই নিয়ম পালন করলে প্রচুর কাজ করবার ক্ষমতা আসবে আপনার মধ্যে। নিজেই বিস্মিত হবেন নিজের ক্ষমতা দেখে।

এক

শুরু করে দিন। শুরু করাটাই সবচেয়ে কঠিন। প্যারাসুট নিয়ে প্লেন থেকে লাফিয়ে পড়ার মত। ঐটুকুই আসল কাজ, ঐখানেই সাহসের প্রয়োজন—বাকিটুকু সহজ ব্যাপার। একবার শুরু হয়ে গেলে দেখবেন হুড়মুড় করে আপন গতিতে এগিয়ে যাবে কাজ, তখন আর কাজকে কাজ মনে হবে না, মজার খেলা হয়ে দাঁড়াবে সেটা।

দুই

আপনি যে কাজই করুন না কেন, সেই কাজে অতীতে এবং বর্তমানে আরও অনেকে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁকে দৃষ্টান্ত হিসেবে চোখের সামনে রাখুন। সামনে দৃষ্টান্ত থাকলে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা আসে, পরিশ্রমকে আর পরিশ্রম

মনে হয় না। কিন্তু তাই বলে প্রতিযোগিতার মনোভাব এবং তার ফলে সৃষ্ট হিংসেহিংসি, মনোমালিন্য, ইত্যাদি ভাল না। সবচেয়ে ভাল হয় যদি নিজেকে দাঁড় করাতে পারেন নিজের প্রতিযোগী হিসেবে। অতীতে যে সিদ্ধি ও মান অর্জন করেছেন, সেই রেকর্ড ভঙ্গ করে নিজেকে আরও উন্নত করবার জন্যে প্রতিযোগিতায় নামছেন আপনি নিজের বিরুদ্ধেই, ক্রমে এগিয়ে যাচ্ছেন সামনের দিকে।

তিন

সময়ের মূল্য দিন। টাকার চেয়ে অনেক বেশি দাম সময়ের। গেলে আর পাওয়া যায় না ফিরে। কাজেই একে ব্যবহার করুন উপযুক্ত মর্যাদার সাথে, যত্নের সাথে। প্রতিটা কাজের জন্যে সময় নির্ধারণ করে নিলে সুফল পাওয়া যায়। কবে বা কখন নাগাদ হাতের কাজটা শেষ করতেই হবে, সে-সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকলে অনেক সুবিধা হয়, নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করবার তাড়া থাকে।

চার

কাজ করতে করতে যখন একঘেয়ে লেগে উঠবে, যখন মনে হবে কিছুই আর মাথায় আসছে না, বজ্রমুঠিটা কেমন যেন আলগা হয়ে আসছে, তখন কিছুক্ষণের জন্যে বিরতি দিন। ঘুরে আসুন। লক্ষ্য করে থাকবেন, কোন মহিলা সেন্ট মেখে ঘরে ঢুকলে চট্ করে

গন্ধটা পাওয়া যায়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যেন মিলিয়ে যায় গন্ধটা। কিন্তু খানিক বাদে যদি সেই মহিলা আবার এসে ঘরে ঢোকে, আবার পাওয়া যায় গন্ধটা। তেমনি আবার কাজের মধ্যে যখন ফিরে আসবেন, ভাল লাগবে কাজটা।

পাঁচ

বিক্ষিপ্ত চিন্তা ভাবনাকে দূর করে দিন। 'লম্পট' শব্দটা আগামী আধমিনিট ভাবব না মনে করে না ভেবে থাকতে পারবেন? পারবেন না। বারবার ঐ শব্দটাই ফিরে আসবে। তেমনি কেবল বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলো মন থেকে দূর করে দেব ভাবলে চলবে না—সেই জায়গায় হাতের কাজ সম্পর্কিত ভাবনা ভরে দিতে হবে। পুরো মনোযোগ দিতে হবে কাজের পিছনে, ঢেলে দিতে হবে মন, ডুবে যেতে হবে কাজের মধ্যে। কেবল তাহলেই দূর হয়ে যাবে বিক্ষিপ্ত চিন্তা।

ছয়

প্রত্যেকটি মানুষের নিজস্ব একটা ছন্দ আছে কাজের। সেই ছন্দকে আবিষ্কার করে নিতে হবে। ছন্দোবদ্ধ কাজ এগোয় বেশি। নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে গায়ের জোরে কাজ করতে গেলে হিতে বিপরীত হওয়ারই সম্ভাবনা।

সাত

কাজটা শেষ করুন। প্রত্যেকটি কাজেরই শুরু, ক্রমবিকাশ এবং শেষ আছে। গল্পের মত কোথায় থামতে হবে জানা দরকার, কতদূর পর্যন্ত করা যথেষ্ট, আগে থেকেই ঠিক থাকা দরকার—নইলে কাজ করেই চলবেন, থামতে পারবেন না। লক্ষ্য স্থির থাকলে আর কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। লক্ষ্যে পৌঁছে হাত-মুখ ধুয়ে অন্য কাজের জন্যে প্রস্তুত হতে পারবেন।

কাজকে একটা ঘটনা মনে না করে যদি উৎপাদন মনে করা যায় তাহলে প্রচুর আনন্দের খোরাক পাওয়া যাবে তা থেকে। নিজের উৎপাদন দেখে নিজেই বিস্মিত হবেন। সেই সাথে অর্থ, প্রতিষ্ঠা সম্মান···মোট কথা জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাবেন।

একাগ্রচিত্ততা

'আমার ভাই কন্‌সেন্ট্রেশন নেই, এক কাজে বসলে হাজারটা চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে মাথার মধ্যে।'

আপনি একা নন, বেশির ভাগ মানুষেরই এই একই অভিযোগ নিজের বিরুদ্ধে—কিছুতেই কাজে মন বসাতে পারি না। সামনে পরীক্ষা, কিন্তু পড়ায় মন বসাতে পারছেন না ; একগাদা ফাইল জমে আছে ডেস্কে, অথচ মাথার ভিতর এখনও তর্ক চলছে ঝগড়াটে রিক্সাওয়ালার সাথে ; গোটা তিনেক চিঠি নিয়ে বসেছেন উত্তর দেবেন, কিন্তু মাথার মধ্যে ঘুরছে রান্নাঘর, দুধওয়ালা, বাজার, বাচ্চার স্কুলের টিফিন, ননদের নতুন কেনা শাড়িটার পাড়—অর্থাৎ যা করতে বসেছেন সেটা ছাড়া দুনিয়ার সব চিন্তা আসছে আপনার মাথায় অনর্গল।

অথচ আমরা সবাই জানি কোনও কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে একাগ্রচিত্ততার একান্তই দরকার। এটা ছাড়া কেউ কোনদিন বড় হতে পারে না। এবং আমাদের সবারই বড় হওয়ার অধিকার আছে। মুখে যতই অস্বীকার করি না কেন—ইচ্ছেও আছে।

ঢাকার একজন নামজাদা বিরাট সার্জেনের কথা জানি, জীবনে কোনদিন ইনজেকশন নেননি ভয়ে, টিকাওয়ালা দেখলে বাচ্চা ছেলের মত বাথরুমে লুকান, গাড়ি চালাতে ভয় পান, প্লেনে বা নৌকোয় উঠলে বমি করেন। এক কথায় নার্ভাস মানুষ। কিন্তু তাঁকেই দেখুন অপারেশন থিয়েটারে। স্থির, নিষ্কম্প হাতে ছুরি চালাচ্ছেন, একটু এদিক-ওদিক হলেই রোগী মারা যাবে, কিন্তু এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই ; সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ তিনি তখন, ধীর, শান্ত, আস্থাশীল ; আত্মবিশ্বাসের জ্যোতি বেরোচ্ছে চোখ-মুখ থেকে।

কি করে সম্ভব হয় এটা? এক কথায় উত্তর দেয়া যায়—একাগ্র-চিত্ততা। কাজের সময় আর সমস্ত চিন্তা দূর হয়ে গেছে সার্জে-নের, সেই সাথে দূর হয়ে গেছে ভয়, ভীতি, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব সব। কাজ ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই তখন তাঁর কাছে।

নানান ভাবে চিত্ত-বিক্ষেপ ঘটছে আমাদের—টেলিফোন, বন্ধু-বান্ধব, বাইরের গোলমাল, কলা রাখবেন কলা, কাগজ আছে কাগজ, দই বগুড়ার দই, এসব তো আছেই ; নিজেদের মধ্যেই রয়েছে পলায়নী মনোবৃত্তি, ভয়, নানান কিছু। অথচ জীবনের যে-কোন ক্ষেত্রে সাফল্য আনতে হলে গভীর একাগ্রচিত্ততা ছাড়া সম্ভব নয়। জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে উপভোগ করতে হলেও চাই এই গুণ। বিক্ষিপ্ত মনে আনন্দকেও উপভোগ করা যায় না।

সূর্যের রশ্মিকে ম্যাগনিফায়িং গ্লাসের মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রীভূত করলে যেমন বহুগুণ বেড়ে যায় তার তেজ, তেমনি মানুষের মনকে

একাগ্র করতে পারলে বহুগুণ বেড়ে যায় তার ক্ষমতা। আশ্চর্য সব কাণ্ড ঘটানো সম্ভব তাকে দিয়ে। এই ক্ষমতাই ব্যবহার করেন প্রতিভাবানেরা। তাঁদের কাজ দেখে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই, কল্পনাও করতে পারি না যে আমাদের দ্বারাও ঐ কাজ সম্ভব—এটাকে একটা ঐশী ক্ষমতা মনে করে তাজ্জব হতেই ভালবাসি।

আপনি হয়ত সোজা বলে দেবেন, ভাই ওসব বিরাট প্রতিভার ব্যাপার, আমার মধ্যে ঐ গুণ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে: সত্যিই কি নেই? আপনি ঠিক জানেন?

আসলে এক পৃষ্ঠা লেখা একবার পড়ে তারপর গড়গড় করে মুখস্থ বলে যাওয়া, প্রকাণ্ড এক গুণ-অংক দুই মিনিটের মধ্যে মনে মনে কষে ফেলা, ইত্যাদি আমাদের মুগ্ধ, বিস্মিত করে ঠিকই, কিন্তু এগুলো কোন অলৌকিক কিছু নয়। সবার মধ্যেই রয়েছে এই গুণ। প্রতিভাবানের সাথে আপনার পার্থক্য—আপনি একে ঠিক মত কাজে লাগাতে পারেন না।

সব শিশুর মধ্যেই এই গুণটা দেখতে পাবেন লক্ষ্য করলেই। কোন একটা মজার ব্যাপার পেলে তার মধ্যে মনপ্রাণ ঢেলে একেবারে মিশে যায় শিশুরা, দুনিয়ার সব কিছু ভুলে ডুবে যায় একাগ্রচিত্তে। তখন ডাক দিলেও সাড়া পাওয়া যায় না। শুনতেই পায় না সে আমাদের কথা। কথা শুনছে না বা অমনোযোগী বলে হয়ত আমরা বকা দিই তখন শিশুকে। আসলে কিন্তু তারিফ করা উচিত। ওদের একাগ্রচিত্ত আগ্রহে কোন অবস্থাতেই বাধা

দেয়া উচিত না। এই গুণটা চর্চার অভাবে আমাদের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায় বলেই আমরা সাধারণ মানুষ থেকে যাই। সুখের বিষয়, চেষ্টা করলে একে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব।

পরিষ্কার মনে আছে, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর ক্লাসের জানালা দিয়ে প্রায়ই দেখতে পেতাম ডক্টর গোবিন্দ চন্দ্র দেবকে। দর্শন বিভাগটা ছিল বাংলা বিভাগের মাথার উপর। লাইব্রেরী থেকে একশো গজ তফাতে দর্শন বিভাগে পৌছতে সময় লাগে দুই কি তিন মিনিট, কিন্তু ডক্টর দেবের লাগত দুই থেকে তিন ঘণ্টা। বইয়ের মধ্যে ডুবে গেছেন তিনি। গ্রীষ্মের খাঁ খাঁ রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে আছেন আপন ভোলা প্রফেসার, একটু একটু দুলছেন, ওঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে নাক চুলকাচ্ছেন, এক পা দু'পা এগোচ্ছেন আনমনে, আবার তন্ময় হয়ে যাচ্ছেন বইয়ের পাতায়। শরীর থেকে ঝরঝর ঘাম ঝরছে, মাথা তেতে উঠছে প্রচণ্ড রৌদ্রে, কিন্তু কিছুই টের পাচ্ছেন না তিনি। অনেককে মুখ টিপে হাসতে দেখেছি। কিন্তু কেউ কি অস্বীকার করতে পারবেন, সারা পৃথিবীতে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হিসেবে স্থান পেয়েছিলেন এই আপনভোলা, শিশুর মতো মানুষটি? এত উপরে উঠতে পেরেছিলেন তিনি নিজের মধ্যে এই শিশুসুলভ গুণটি বজায় রাখতে পেরেছিলেন বলেই।

ঠিক এইরকম একাগ্রচিত্তে কাজের মধ্যে ডুবে যেতে না পারলে কোন কাজই সর্বাঙ্গ-সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করা যায় না। জীবনে যে-কোন ক্ষেত্রে শিখরে উঠতে হলে এ ছাড়া আর কোন শর্টকাট

রাস্তা নেই।

মজা না পেলে, তীব্র ভাবে আকর্ষণ অনুভব না করলে কোন কাজে মন দেয়া যায় না। মজা পেলে আপনিই মন বসে যায়, তখন আর একাগ্রচিত্ততার জন্যে সাধনার প্রয়োজন পড়ে না। এই সত্য আমরা সবাই জানি। তেমনি আর একটি সত্যও আমাদের জেনে রাখা দরকার। যে কোন কাজে যেমন মজা লাগলে মন বসে, তেমনি মন বসালেও মজা লাগে। তা সে যত বিরক্তিকর কাজই হোক না কেন।

কি করে মন বসানো যায়? ঝাঁপিয়ে পড়ুন। যে কোন কাজ, ভাল লাগুক বা না লাগুক, শুরু করে দিন। প্রথমদিকে একটু জোর খাটাতে হবে নিজের উপর, তারপর দেখবেন কখন যে ডুবে গেছেন আপনি সেই কাজের ভিতর টেরই পাননি। এ এক মজার খেলার মত। একবার শুরু করে দিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর দেখবেন, রীতিমত মজা লাগছে আপনার কাজটা করতে। এটা হবেই। এই সত্যটা যদি মনের মধ্যে বসিয়ে নিতে পারেন, তাহলে কোন কাজ শুরু করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না আপনার; কারণ আপনি জানেন একবার শুরু করে দিলেই মজা লেগে যাবে, এমনই বসে যাবে মনটা যে ছাড়তে ইচ্ছে করবে না।

কাজ শুরু করার সাথে সাথেই যে মন বসে যাবে এমন নয়। নানান রকমের চিন্তা, ভাবনা, শব্দ ঘুর ঘুর করতে চাইবে মাথার মধ্যে। এগুলোকে তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই, একটা

গেলে আরেকটা আসবে, যদি না ফাঁকটা হাতের কাজ সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা দিয়ে ভরিয়ে নিই। অর্থাৎ অবান্তর চিন্তা কেবল দূর করে দিলেই চলবে না, হাতের কাজের মধ্যে মন দেবার চেষ্টা করতে হবে।

তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে? কোন একটি (দুই-তিনটি নয়) কর্তব্য-কর্ম বেছে নিচ্ছেন। প্রথমে আপনার ভাল লাগছে না, তবু সাহসে ভর করে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, শুরু করে দিচ্ছেন। নানা বিশৃংখল চিন্তা আসছে আপনার মাথায়। ওগুলো দূর করে দিয়ে কাজের চিন্তায় মন দিচ্ছেন। কাজটা ভাল লাগতে শুরু করেছে আপনার কাছে। রীতিমত মজা পেতে শুরু করেছেন এখন। মজার সাথে সাথে আসতে শুরু করেছে একাগ্রচিত্ততা। ক্রমে ডুবে গেলেন আপনি কাজে। যখন কাজটা শেষ হল তখন দেখলেন আপনার পক্ষে যতদূর সম্ভব ঠিক ততটাই ভাল হয়েছে কাজটা।

ব্যাস, আর কি চাই। যার যা ক্ষমতা তার পূর্ণ প্রয়োগ হলেই আসছে সার্থকতা।

একাধিক কাজ আছে সবারই হাতে। প্রথমেই বেছে নিতে হবে কোন্‌টা করব। একটা শেষ না করেই অন্যগুলোর চিন্তায় পীড়িত হব না কিছুতেই। সব কাজই করব, কিন্তু একটা একটা করে। একটা শেষ করে ধরব আরেকটা। একসাথে করতে গেলে কোনটাই হবে না।

অভ্যাসে বৃদ্ধি পায় একাগ্র মনোযোগের ক্ষমতা। সমস্ত

আজেবাজে চিন্তাকে হটিয়ে দিয়ে একটি কাজে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করবার ক্ষমতাটা আসে নিরলস চেষ্টা থেকে। বারবার বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলোর হাত থেকে মনোযোগ ছিনিয়ে এনে যদি একটি বিশেষ কাজের পিছনে লাগানো যায়, তাহলে বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলো প্রতিযোগিতা ছেড়ে দিয়ে হার মানতে বাধ্য হয়। এই অভ্যাস ক্রমে স্বভাবে পরিণত হবে, এবং যখন খুশি যে কোন কাজে মন বসাতে মোটেই অসুবিধে হবে না আর।

এর ফলে কেবল যে জীবনে প্রতিষ্ঠা এবং সাফল্যই আসবে তা নয়, কাজের ক্ষমতা বেড়ে যাবে কয়েক গুণ, এবং সবচেয়ে বড় লাভ যেটা, কাজের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাওয়া যাবে। জীবনটা অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে।

সুখের অন্বেষণ

সুখ অ-সুখ দুই নিয়েই জীবন। সর্বক্ষণ সুখী কিংবা সর্বক্ষণ অ-সুখী মানুষ পৃথিবীতে নেই। কোন সময় একটার প্রভাবে থাকি, কোন সময় অপরটার—এসব কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, যদিও সুখের অভাবটা আমরা প্রত্যেকে পরিষ্কার বুঝতে পারি, সুখ বলতে ঠিক কাকে বোঝায়, সে সম্পর্কে আমাদের বেশির ভাগেরই কোন স্পষ্ট ধারণা নেই।

আপনি সহজেই কল্পনা করতে পারবেন পরাজিত হলে, উদ্বিগ্ন হলে, নিরাশ হলে, বা কটু সমালোচনার সম্মুখীন হলে কেমন লাগে। কিন্তু নিজের অভ্যন্তরীণ গুণ ও ক্ষমতার পরিপূর্ণ প্রয়োগ করতে পারলে, জীবনটাকে সর্বতোভাবে উপভোগ করতে পারলে ঠিক কেমন লাগে কল্পনা করতে কষ্ট হয়। হয় না? খুব একটা পরিষ্কার ছবি ফুটে ওঠে না মনের পর্দায়। কিন্তু যদি উঠত, যদি পরিষ্কার ধারণা থাকত সুখ জিনিসটা কি, কি খুঁজছি আমরা, কতটা আশা করা যায় এই জীবন থেকে, তাহলে সেটা আহরণ

করা সহজতর হত। তাই না?

বছর পঁয়ত্রিশেক আগে সাইকোলজির এক জাঁদরেল প্রফেসার আব্রাহাম এইচ. ম্যাসলো গবেষণা শুরু করেছিলেন এ নিয়ে। সুখ কাকে বলে, কি এর আকৃতি-প্রকৃতি এসব থিওরী নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ম্যাসলো ঠিক করলেন সুখী মানুষ খুঁজে বের করে তাদের বিশেষত্বগুলোকে ভাল করে পরীক্ষা করলে বেরিয়ে আসবে আসল কথা। জীবন্ত মানুষের মধ্যেই খুঁজতে হবে সমাধান।

শুরু হল গবেষণা। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যাদেরকে ওঁর মনে হল অন্যদের চেয়ে বেশি সুখী, প্রথমে তাদের জান জ্বালিয়ে খেলেন, তারপর ধরলেন বড় বড় সব নামজাদা লোকদের। বহুদিন পর্যন্ত আশেপাশের সুখী লোকদের নিস্তার ছিল না প্রফেসারের হাত থেকে। যাকেই সুখী মনে হয়েছে, তারই পিছনে লেগে গিয়েছেন তিনি আদা-জল খেয়ে। তাদের সাথে কথা বলেছেন, তারা কিভাবে চলে, ফেরে, কাজ করে, লক্ষ্য করেছেন, তাদের অতীত জীবন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং শেষ পর্যন্ত বের করে ছেড়েছেন তাদের বৈশিষ্ট্য। আর সবদিক থেকে ওরা আমার-আপনার মতই, শুধু একটা বিশেষত্ব রয়েছে ওদের—ওরা পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করছে নিজেদের, অর্থাৎ ওরা যা হতে পারত তাই হয়েছে। প্রকৃতিদত্ত গুণ ও ক্ষমতার পূর্ণ প্রয়োগ ঘটছে ওদের কাজে কর্মে, খেলায়, কথাবার্তায়, সবকিছুতে। 'আত্ম'র বাস্তবায়ন ঘটেছে তাদের জীবনে।

ভাল কথা। বুঝলাম, ওরা আত্ম-বাস্তবায়ন করেছে, ওরা সুখী। তাতে আমার কি? আমিও কি ওদের মত সুখী হতে পারব?

ম্যাসলো বলছেন, পারবে।

এজন্যে বিশেষ গুণের প্রয়োজন নেই?

ম্যাসলো বলছেন, বিশেষ গুণ তোমার আছে।

বাঃ। বিশেষ গুণও রয়েছে আমার মধ্যে! তাহলে কিসের অভাব রয়েছে আমার যে আমি ওদের মত হতে পারছি না? আশেপাশে সুখী মানুষ যে দেখছি না তা নয়—দেখছি। ওরা কোন্ দিক থেকে আমার থেকে আলাদা?

এর উত্তরে ম্যাসলো কয়েকটা গোপন কথা জানাচ্ছেন আমাদের। যাদের নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাদের মধ্যে কয়েকটি ব্যাপারে আশ্চর্য মিল খুঁজে পেয়েছেন তিনি। সেগুলো নিয়ে আলোচনা করলেই আমাদের ধারণা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। দেখা যাবে ঐসব ব্যাপার আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরের কিছুই নয়।

কাজের মধ্যে মন ঢেলে দেয়া

মন-প্রাণ ঢেলে কোন না কোন কাজের মধ্যে মগ্ন থাকতে দেখেছেন ম্যাসলো প্রতিটি সুখী মানুষকে। যে-লোক কোন একটা কাজ, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের পিছনে মন-প্রাণ ঢেলে না দেয়, সে নিজের মধ্যে আবদ্ধ আছে। আত্মকেন্দ্রিকতার মায়াজাল থেকে বেরোতে না পারলে নিজের বাইরে আর কিছুতেই মন দেয়া সম্ভব হয়

না। যখন আত্মপ্রেম কাটিয়ে উঠে বাইরের কিছুতে মন দেয়া যায় তখনই, কেবলমাত্র তখনই সুখের মুখ দেখতে পাওয়া যায়। কাজ ও দায়িত্বের মধ্যেই হঠাৎ করে পাওয়া যায় সুখের সন্ধান।

তাছাড়া হাতে কাজ থাকলে নিজেকে প্রার্থিত, কাঙ্ক্ষিত মনে হয়, মনে হয় এই দুনিয়ায় আমার প্রয়োজন আছে। এই অনুভূতিটা মানুষের জন্যে একান্ত দরকারী। অনেক ক্ষমতা দেয় এটা মানুষকে। এই জন্যেই শিশু বা অসুস্থ সন্তানের জননীরা অন্যান্য মায়েদের তুলনায় অনেক সুস্থ থাকেন। সন্তানের কাছে প্রয়োজনীয় তিনি।

ম্যাসলো বলছেন, লক্ষ্য স্থির করে নিয়ে লেগে যাও কাজে। প্রতিদিন এমনভাবে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়, যেন এরই উপর নির্ভর করছে তোমার জীবন মরণ। ডুবে যাও কাজের মধ্যে, বুঁদ হয়ে যাও, দেখবে, দেবতার আশীর্বাদের মত সুখের বৃষ্টি নামবে তোমার চারপাশে।

নিজেকে মেনে নেয়া

ম্যাসলো দেখেছেন, বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা উদ্বিগ্ন না হয়েই এরা স্বীকার করতে পারে নিজের দোষগুণ। এরা আসলে মেনে নিয়েছে নিজেদেরকে। দুনিয়ার সবাই সব কিছুর জন্যে তৈরি হয়নি। আমি লেখক যদি গায়ক হতে যাই সেটা আমার প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজ হবে। আমার স্বীকার করে নেয়া উচিত, গান শুনতে যতই ভাল লাগুক, গান গাইতে যত ইচ্ছেই করুক, হাত

তালির বহর দেখে যত ঈর্ষাই আসুক, আমার জন্য গান নয়, প্রকৃতি আমাকে সে গুণ দেয়নি। আমি নিজে ঠিক যা, সেই হিসেবেই চিনতে হবে নিজেকে, রঙিন কাঁচের ভিতর দিয়ে রঙিন করে দেখলে চলবে না; এবং নিজের প্রকৃতিকে মেনে নিতে হবে সহজভাবে। প্রিয় বন্ধুকে যেমন তাঁর দোষত্রুটি সত্ত্বেও পছন্দ করি, ভালবাসি, সহ্য করি, বুঝি—ঠিক তেমনি একটা সম্পর্ক গড়ে নিতে হবে নিজের সাথে নিজের। তা না করে আমরা অনর্থক নিজেকে কঠোর সমালোচনা করে ব্যতিব্যস্ত রাখি সবসময়, ক্ষুব্ধ হই নিজের দুর্বলতায়, উদ্বিগ্ন হই নিজের অক্ষমতায়, বিরোধিতা করি নিজেরই।

নিজেকে মেনে নিলে সহজ হয়ে যায় জগৎ। মেয়েরা চিরকাল যুবতী থাকার প্রাণান্তকর চেষ্টা ছেড়ে দেয় হাসিমুখে। পুরুষরা ক্ষমতা, গুরুত্ব বা সম্মানের দিক থেকে যা নয় তার ভান করা থেকে বিরত হয়। হাসিমুখে স্বীকার করতে পারে নিজের দুর্বলতা, অক্ষমতা। যা নই তার ভাব দেখাতে গেলেই গেল সব সুখ-শান্তি। দোষেগুণে আমি যা, মনের মধ্যে কোন রকমের আক্রোশ না রেখে তাকে মেনে নিলেই আসবে প্রশান্তি, নচেৎ নয়।

এই ধরনের মানুষ অদ্ভুত এক শক্তি অর্জন করে শোক, দুঃখ, বিপদ কাটিয়ে উঠে সহজভাবে জীবন যাপন করবার। ভান করবার প্রয়োজন হয় না এদের। নিজের প্রকৃতি, নিজের মতামত, নিজের ভাল লাগা না লাগা, নিজের ইচ্ছা, নিজের আবেগ, ইত্যাদি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকায় কোন্ ছবি বা বই ভাল

লাগছে সে-সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করতে এদের গোপনে সমালোচকের মন্তব্য পড়ে নেয়ার প্রয়োজন হয় না।

নিজের মধ্যে যা নেই তাই নিয়ে আক্ষেপ না করে যা আছে তাই নিয়ে সুখী থাকতে হবে। মেনে নিতে হবে নিজেকে।

অনিশ্চয়তাকে সয়ে নেয়া

ভবিষ্যৎ চিরকাল অনিশ্চিত। এই অনিশ্চয়তাকে, অজানাকে সহজভাবে মেনে নেয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছে সুখী মানুষেরা। অজানা এদেরকে ভীত করতে পারে না। শংকিত হওয়া ত দূরে থাক, এরা বরং উৎসাহের সাথে এগিয়ে যায় অজানাকে জানার জন্যে। এরা জানে অনিশ্চয়তা না থাকলে জীবনে রোমাঞ্চ বলতে কিছুই থাকবে না, বেঁচে থাকার আনন্দ থাকবে না। অজানা বা অনিশ্চিতকে সব সময় দূরে ঠেলে রাখলে অনেক নতুন কিছু থেকে বঞ্চিত হবেন আপনি। অজানাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে হবে। অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দেয়ার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি থাকা দরকার।

এই প্রস্তুতি ছিল বলেই কেমব্রিজের বিখ্যাত গাণিতিক জি. এইচ. হার্ডির কাছে যেদিন ভারতের এক অর্ধ শিক্ষিত কেরাণী রামানুজনের পাঠানো এক বাণ্ডিল পাণ্ডুলিপি এসে হাজির হল, অন্যদের মত সেটা না পড়েই ফিরিয়ে দেননি তিনি। ভুল ইংরেজি আর সস্তা কাগজ উপেক্ষা করে দেখতে চেয়েছেন আসলে কি লিখেছে লোকটা। ঘন্টাখানেক ব্যয় করবার পরই পৃথিবী-বিখ্যাত গাণিতিক আবিষ্কার করলেন কত বড় একটা প্রতিভা পড়ে রয়েছে

জাদানের এক কোণে। বিস্মিত প্রফেসার বাধ্য করলেন বিশ্ববিদ্যা-লয় কর্তৃপক্ষকে ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে রামানুজনকে বিলেতে নিয়ে আসতে, রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হিসেবে রামানুজনকে নির্বাচিত করার ব্যবস্থা করলেন, এবং গণিত শাস্ত্রের পাঁচটি অমূল্য বই লিখলেন তার সহযোগিতায়।

বাস্তবধর্মিতা

ম্যাসলো দেখেছেন, আত্ম বাস্তবায়নকারীরা অত্যন্ত বাস্তববাদী। কোন কিছুর মধ্যে কৃত্রিমতা, নকল বা প্রবঞ্চনা থাকলে অতি সহজে টের পায় এরা। রঙিন চশমার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীকে দেখে না এরা। অর্থাৎ যা দেখতে পাচ্ছে তাই দেখে, নিজের মনের রঙ মিশিয়ে, নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়-ভীতির প্রতিফলন ঘটিয়ে বাস্তবকে বিকৃত করে দেখে না। পানি জিনিসটা কেন ভেজা, বা পাথর কেন শক্ত, সে নিয়ে তাদের অভিযোগ নেই।

মানুষকে সরাসরি সহজ দৃষ্টিতে দেখতে পায় বলেই কারো ব্যবহারে হতাশা আসে না তাদের। যে যেমন, তাকে সেইভাবেই গ্রহণ করে তারা, নিজের মনে মনে একটা মানদণ্ড তৈরি করে নিয়ে আশা করে না যে অন্যেরা সেই মত চলবে। কাজেই আশা ভঙ্গ হয় না তাদের।

আশেপাশের অভাব, অভিযোগ, অন্যায়, অবিচার তাদের ব্যথিত করে ঠিকই, এবং এসবের প্রতিকারও চায় তারা—কিন্তু রাতারাতি পৃথিবীটাকে ভাল করে তোলার বৈপ্লবিক সুখ-স্বপ্নে

বিভোর হয় না, কিম্বা উৎকণ্ঠায় পীড়িত হয় না। চরমপন্থী নয় এরা কোন ব্যাপারেই। শান্ত সাবলীল ভঙ্গিতে নিরলস কাজ করে যায় এরা সবার মঙ্গলের জন্যে।

মুগ্ধ বিস্মিত হবার ক্ষমতা

সাধারণ সব ব্যাপারে মুগ্ধ হতে দেখেছেন ম্যাসলো সুখী মানুষদের। বিস্মিত হবার আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে এইসব লোকের মধ্যে। সাদামাঠা কোন ব্যাপার, যেটা আমার-আপনার চোখেই পড়বে না নিয়মিত দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি বলে—তারই মধ্যে অদ্ভুত বিস্ময়ের উপাদান আবিষ্কার করে বসবে আত্ম-বাস্তবায়নকারীরা। পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে প্রশংসায়। সাধারণ সব ব্যাপার—উজ্জ্বল একটুকরো রোদ, চমৎকার বিকেল বা পাখির ডাক, মিষ্টি হাওয়া, সদ্যফোটা ফুল, সুন্দর একটা গল্প, সূর্যাস্ত, এইসব নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার যা আর সবার কাছে ডাল-ভাত হয়ে গেছে, বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দিচ্ছে তাদের। জীবনের ভাল দিকগুলো বার বার আনন্দ দিচ্ছে তাদের নতুন ভাবে। প্রত্যেকটি লোক, প্রত্যেকটি ঘটনা কোন না কোন দিক থেকে অপূর্ব। সেই অপূর্ব থেকে আনন্দ আহরণে ক্লান্তি নেই এদের। শিশুদের মত।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, সুখী মানুষের যে কটা গুণ মনস্তত্ত্ববিদ ম্যাসলো লক্ষ্য করেছেন, তার কোনটাই আমার-আপনার আওতার বাইরে নয়। সুখের চরম মুহূর্তে তারা যা উপলব্ধি করে আমরাও চেষ্টা করলে তা উপলব্ধি করতে পারি। সেই মুহূর্তে

সমস্ত দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, ভয়, উৎকণ্ঠা দূর হয়ে গিয়ে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সাথে একটা গভীর একাত্মবোধ আসে। সরাসরি চেষ্টা করে এই বোধ আনা সম্ভব নয়। এটা আসে মাঝে মাঝে—আকস্মিকভাবে, হঠাৎ এসে ভাসিয়ে দেয় আনন্দের বন্যায়, বিস্ময়ে বিহ্বল করে দেয়। তবে আমরা নিজেদের প্রস্তুত রাখতে পারি, সবকিছুর মধ্যেই যে অদ্ভুত রহস্য রয়েছে সেটা উপলব্ধি করবার অভ্যাস তৈরি করে নিতে পারি।

এই আকস্মিক আনন্দের মুহূর্তগুলোই মানুষকে সাদামাঠা-ভাবে বেঁচে থাকার উর্ধ্বে তুলে নিয়ে জীবনের অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থের সন্ধান দেয়। আইনস্টাইনের উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করা যাক :

'নিগূঢ় রহস্যের উপলব্ধি হচ্ছে নির্মলতম অভিজ্ঞতা। এই মৌলিক আবেগই সত্যিকার বিজ্ঞান শিল্পসৃষ্টির উৎস।'

দাম্পত্য-জীবন

নানান বাধাবিপত্তির মধ্যে দিয়ে রূপকথার কাহিনী যখন শেষ হয়: তারপর রাজকুমারের সাথে বিয়ে হয়ে গেল রাজকনের— আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচি, যাক বাবা, এত রাক্ষস-খোক্কস, ডাইনী আর দৈত্য-দানোর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে শেষ পর্যন্ত মিলন হলো তাহলে! যখন বলা হয়: এরপর তারা সুখে-শান্তিতে রাজত্ব করতে থাকল—বিনা আপত্তিতেই মেনে নিই ব্যাপারটা। বিয়ে যখন হয়েই গিয়েছে, তখন সুখে-শান্তিতে ত থাকবেই। কিন্তু আসলে কতটুকু সুখী হয় মানুষ বিয়ের পর? বিয়ে হলেই সুখ-শান্তি এসে গেল ধরে নেয়া যায়?

এর সঠিক উত্তর পেতে হলে কয়েকটা ব্যাপার একটু বুঝে নেয়া দরকার। বৈবাহিক জীবনের সুখ বা শান্তি অনেক কিছুর উপর নির্ভরশীল। বেশির ভাগটাই যদিও নির্ভর করে স্বামী-স্ত্রী দু'জনের উপর; সমাজ, শ্বশুরকুলের আত্মীয়স্বজন এবং নিজেদের সন্তানদের উপরও নির্ভর করে অনেকখানিই।

'মেণ্টাল হাইজিন' বলে ইয়া মোটা এক বইয়ে ব্রুকলিন কলেজের অধ্যাপক ডক্টর লেস্টার ডি ক্রো এবং ডক্টর অ্যালিস ক্রো বলছেন: বৈবাহিক জীবনে সুখ-শান্তি পেতে হলে দম্পতির মধ্যে রুচিসম্মত, পরিণত, সুসমঞ্জস, তৃপ্তিদায়ক যৌন সম্পর্ক থাকতে হবে। সন্তানোৎপাদন ও তাদের লালন পালনের ব্যাপারে পরস্পরের আশা আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকতে হবে; ভাবাবেগের পরিপক্কতা থাকতে হবে; নিজেদের মধ্যে সমঝোতা ও সহিষ্ণুতা থাকতে হবে; সমাজ-অনুমোদিত কোন লক্ষ্যে পৌঁছতে পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতা দানের ইচ্ছা ও উদ্যোগ থাকতে হবে এবং অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে একই বিষয়ে উভয়ের আগ্রহ ও উৎসাহ থাকতে হবে। এতগুলো ব্যাপারের কোন একটি ব্যাপারে যদি গোলমাল বা জোড়া না লাগবার মত মতবিরোধ থেকে যায়, তাহলেই কলহবিবাদ আর ভাঙন প্রায় অবধারিত।

পাশ্চাত্য দেশে বিয়ের আগে যুবক যুবতীর মেলামেশার ব্যবস্থা রয়েছে, পরস্পরকে চিনে নেয়ার অনেক সুযোগ রয়েছে। এটা যে আমাদের জন্যেও ভাল, বা এই নিয়ম আমাদের দেশেও প্রবর্তিত হওয়া উচিত—এক্ষুণি এমন কথা আমি বলতে চাই না। তবে এর ফলে ওরা যে মনের মিতা বাছাই করে নেয়ার মস্ত সুযোগ পায় তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সবাই যে ওরা বুদ্ধিমত্তার সাথে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তা-ও না, বিবাহ বিচ্ছেদের হারের দিকে এক নজর চাইলেই বোঝা যায়

কি পরিমাণ ভুল হয়ে যায় ওদের সঙ্গী বাছাই করায়। তবে সুযোগ ওরা পায় সঙ্গীর মেজাজ-মর্জি বুঝবার, চালচলন দেখবার। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জেনে নিতে পারে যৌন-জীবন সম্পর্কে পরস্পরের ধ্যানধারণা। বুঝে নিতে পারে কে কয়টা ছেলেমেয়ে হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে, কেমন ধরনের সংসার কার পছন্দ, কিভাবে রোজগার হবে এবং খরচ হবে, ধর্মবিশ্বাস কার কি রকম, ছেলেমেয়েদের কিভাবে মানুষ করা উচিত বলে মনে করে হবু স্বামী বা স্ত্রী। আগে থেকেই স্থির করে নিতে পারে বিয়ের পর পরস্পরের আত্মীয়স্বজনের সাথে তারা ঠিক কতটা এবং কেমন সম্পর্ক বজায় রাখবে, সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের কোনটাকে কে কতটা গুরুত্ব দেয়, খেলাধুলা বা অবসর বিনোদনের ব্যাপারে ঠিক কতটা ওরা একসাথে উপভোগ করবে, কতটা আলাদাভাবে। মেয়েদের জন্যে বিশেষভাবে দরকার স্বামীর পেশাগত কাজকর্ম সম্বন্ধে তার যথেষ্ট পরিমাণে আগ্রহ বা জ্ঞান আছে কিনা বিয়ের আগেই পরিষ্কারভাবে বুঝে নেয়া। কারণ, দিনের একটা মস্ত অংশ ব্যস্ত থাকে পুরুষ পেশাগত কাজকর্ম আর চিন্তা ভাবনায়; এসব ব্যাপারে নারী যদি একেবারেই বাদ পড়ে, কোনভাবেই নিজেকে যুক্ত না করে, তাহলে মস্ত এক পাঁচিল তৈরি হয়ে যায় স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে।

আমাদের দেশে বেশির ভাগ বিয়েই ছেলেমেয়েরা করে না, বাপ-মায়েরা দেন; অনেক সময় ছেলেমেয়েদের মতামতের তোয়াক্কা না রেখেই। তাঁরা ফ্যামিলি দেখেন, স্বাস্থ্য দেখেন, ছেলের

উপার্জন-ক্ষমতা আর মেয়ের রূপ দেখেন—পছন্দ হলেই, ব্যাস, কাজ শেষ। কথা নেই বার্তা নেই, চেনা নেই, জানা নেই, এক কলেমা বা মন্ত্রের জোরে সবচেয়ে আপনজন হয়ে গেল সম্পূর্ণ অপরিচিত দুটো মানুষ। এর পরেও তো টিকে যাচ্ছে বেশির ভাগ বিয়েই, ছাড়াছাড়ি বা তালাক আর ক'টা হয় এদেশে? টিকে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এই টিকে থাকার পিছনে প্রধান কারণ হচ্ছে মেয়েদের অসীম ধৈর্য ও পরম সহিষ্ণুতা। এ ব্যাপারটাতে মহত্ত্ব আরোপ করে মেয়েদের স্তুতিগান গেয়ে তাদের আরও সহিষ্ণু, আরও ধৈর্যশীলা হতে উদ্বুদ্ধ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এটাই বাস্তব সত্য। এবং মেয়েরা যে স্বেচ্ছায় এই ভূমিকা নিয়েছেন, তাও আমি মনে করি না। অনুন্নত পুরুষ-শাসিত সমাজে, যেখানে পুরুষ যা খুশি তাই করতে পারে, সেখানে এটাই স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে আলোচনার খুব একটা স্কোপ নেই।

ইদানীং, বিশেষ করে এদেশের শহরাঞ্চলে, ছেলেমেয়েদের মেলামেশার সুযোগ বিস্তৃততর হচ্ছে। বিয়ের আগে পরস্পরকে কিছুটা অন্তত বুঝে নেয়ার সুযোগ পাচ্ছে ছেলেমেয়েরা। শিক্ষিত বাপ-মা বেশ কিছুটা ঢিল দিতে শুরু করেছেন, মূল্য দিতে চাইছেন ছেলেমেয়ের মতামতের। এইসব বাপ-মা এবং তাঁদের ছেলেমেয়ে এ আলোচনা থেকে কিছুটা উপকৃত হলেও হতে পারেন। লাভ ম্যারেজ করলেই সংসারে অশান্তি হয়, এই ভ্রান্ত ধারণা সমাজে স্বীকৃত সত্য হয়ে উঠবার আগেই আজকের ছেলেমেয়েদের জেনে নেয়া দরকার, বৈবাহিক সুখ-শান্তির জন্যে কোন্

কোন্ শর্ত পূরণ না করলেই নয়। যাঁরা আগেকার নিয়মে বিয়ে করে সংসারী হয়ে গেছেন, তাঁরাও একটু অদল বদল করে নিয়ে এসব নিজের জীবনে প্রয়োগ করে সুখী হতে পারবেন।

বিয়ের সাথে সাথেই স্বামী-স্ত্রীর অন্য নারী বা পুরুষের সাথে প্রাক-বৈবাহিক সমস্ত মধুর সম্পর্কের ইতি টানতে হবে। বিয়ের পর কলহ ও অশান্তি এড়াবার এটাই প্রথম শর্ত। স্বামীর বান্ধবী-দের প্রতি তাকে বিয়ের পরেও মনোযোগ দিতে দেখলে ঈর্ষাকাতর না হয়ে কোন স্ত্রীর উপায় নেই। স্বামীর মুখে তাদের বিশেষ গুণের প্রশংসা শুনলে ত কথাই নেই, নিজের সাথে তাদের তুলনা করে অশেষ মনঃকষ্ট ভোগ করবে স্ত্রী, মনে মনে ভেবে নেবে তাকে বিয়ে করে সুখী হতে পারেনি তার স্বামী। তেমনি স্ত্রীর মুখে যদি শোনা যায়ঃ তুমি আর কি, অমুক সি. এস. পি. তমুক এঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার আমাকে বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিল, শুধু মাথায় মস্ত টাক দেখে রাজি হইনি আমি তখন— তাহলে স্বামীর কাছেও ব্যাপারটা সুখকর হতে পারে না কিছুতেই। তার কাছে মনে হবে, চাঁদি বরাবর গোটাকয়েক চুল আছে বলেই অযোগ্য লোককে স্বামী হিসেবে বাছাই করে এখন পস্তাচ্ছে বুঝি তার স্ত্রী। আর্থিক বা সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে যদি সেই টেকো লোক তার চেয়ে ভাল অবস্থায় থাকে তাহলে ত কথাই নেই, জ্বলে পুড়ে অস্থির হয়ে যাবে স্বামী। কাজেই এইসব ব্যাপারগুলো পরিহার করে চলতে হবে দু'জনকেই, বিয়ের আগের বন্ধু বা বান্ধবীর সাথে মেলামেশা এবং তাদের

নিয়ে আলোচনা বন্ধ করতে হবে। কথায় এবং কাজে দু'জনকেই প্রমাণ করতে হবে অতীতের পাট চুকে গেছে, বিয়ের পর তারা পরিপূর্ণভাবে একে অন্যের।

এরপরই আসে শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়-স্বজনের যন্ত্রণার কথা। আমাদের দেশে মেয়েরা এই যন্ত্রণায় ভোগে বেশি, বিদেশে হয় এর উল্টোটা—ছেলেদেরকেই বরং পাগল ক'রে তোলে তাদের শাশুড়ী। যাই হোক, এর কোনটাই সুখকর অবস্থা নয়। রূঢ়তার মধ্যে না গিয়ে ব্যাপারটাকে সহানুভূতির সাথে দেখা দরকার। দু'জনেরই বোঝা উচিত বিয়ের আগে স্বামী ও স্ত্রী বহু বছর কাটিয়েছে বাপ-মা, ভাইবোনের সাথে। কেবল স্নেহ-মমতাই নয়, দীর্ঘকালের অভ্যাসের বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে তারা নিজ নিজ আত্মীয়স্বজনের সাথে। বাইরের একজনের কাছে যতটা লাগবে, রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়ের খারাপ আচরণ অন্যজনের কাছে ততটা খারাপ লাগবে না। এটা ঠিক, যে-কোন সংসারে আসল লোক স্বামী-স্ত্রী নিজেরা দু'জন, অন্যদের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে হবে দু'জনকেই সুখী হতে হলে। কিন্তু হ্যাঁচকা টান না দিয়ে এটা ধীরে ধীরে সইয়ে নিয়ে করাই ভাল। ছেলেদের বুঝতে হবে বিয়ে করে তারা চাকরাণী আনেনি, সুখ-দুঃখের চিরসঙ্গিনী, সহধর্মিণী এনেছে—তাকে উপযুক্ত মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার দায়িত্ব তারই। তেমনি মেয়েদের বুঝতে হবে মর্যাদা নিজগুণে অর্জন করে নিতে হয়, স্বামীর আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হরদম নালিশ বা কটূক্তি বিঘ্ন সৃষ্টি করে শান্তির, অনেক সহ্য করে বুদ্ধিমতীর মত

মাথা খাটিয়ে সাহায্য করতে হয় স্বামীকে শৃঙ্খল কাটবার ব্যাপারে।...অবশ্য এ ব্যাপারে আত্মীয়স্বজনেরও মস্ত দায়িত্ব রয়েছে। তাদের উচিত নিজেদের থেকেই বাঁধন আলগা করে ছেলে বা ভাইকে যত দ্রুত সম্ভব সুখী হওয়ার পথ মুক্ত করে দেয়া।

এরপর আসে ছেলেমেয়েদের কথা। একটা সন্তান এলেই ভোল পাল্টে যায় সংসারের, নানান রকম প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এসে যায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যেও। বিয়ের পর প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় পর্যন্ত বেশ কিছুটা সময় হাতে পায় স্বামী-স্ত্রী। মোটামুটি একটা সমঝোতায় এসে যায়। প্রাথমিক মতবিরোধগুলোর ধার কমে আসে অনেকটা। পরস্পরের চালচলন, কথাবার্তা আর অভ্যাসের সাথে অনেকটা মানিয়ে নেয় দু'জনেই। কিভাবে সংসার চলবে তার একটা প্যাটার্ন তৈরি হয়ে যায়, সামাজিক ক্রিয়াকলাপে তাদের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে আসে দু'জনের কাছেই। কিন্তু বাচ্চাটা হওয়ার সাথে সাথেই ওলোটপালোট হয়ে যায় সমস্ত নিয়ম, শৃঙ্খলা। যেভাবে চলছিল সেই একই ভাবে আর জীবনযাত্রা চালানো যায় না। নতুনভাবে করতে হয় বাজেট, সকালে নাস্তার দুটো ডিম নেমে আসে একটায়—স্বামী বলে, তুমি খাও, তোমার শরীরের জন্যে দরকার; স্ত্রী বলে তুমি খাও, শরীরের ওপর দিয়ে যে ধকল যায় বাইরের কাজে, একটা অন্তত ডিম না খেলে শরীর টিকবে কেন? কোলের বাচ্চা নিয়ে সব সামাজিক অনুষ্ঠানে স্ত্রীর পক্ষে যোগ দেয়া সম্ভব হয় না, ফলে স্বামীকে যেতে হচ্ছে একা। বাচ্চাটার কিভাবে যত্ন নিতে হবে

তা নিয়েও বাধতে পারে মতবিরোধ। বাড়তি রোজগারের চেষ্টায় স্বামীকে বেশিক্ষণ থাকতে হতে পারে বাড়ির বাইরে। স্ত্রীর কাছ থেকে যে মনোযোগ ও খাতির-যত্ন এতদিন পেয়েছে স্বামী, সেটা ভাগ হয়ে যাচ্ছে দুইভাগে, ফলে অনেক কিছুই যা স্ত্রীর কাছ থেকে আশা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো সে এতদিন, সে-গুলো সব পূরণ হচ্ছে না। প্রসূতির স্বাস্থ্য নিয়েও নতুন সমস্যা দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ বদলে যাচ্ছে সংসারের ধারা, এই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীকে নতুন ভাবে।

আরও ছেলেমেয়ে যখন আসবে, বড় হতে থাকবে, বাপ-মায়ের সময়, মনোযোগ ও টাকার উপর বাড়তে থাকবে তাদের দাবি, উদ্ভব হবে নতুন নতুন সমস্যার। তাদের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা বাপ-মায়ের থেকে আলাদা। তারা নতুন জেনা-রেশন। স্বামী-স্ত্রীকে এই সবকিছুর সাথে মানিয়ে নিয়ে এগোতে হবে সামনের দিকে, আনতে হবে সাংসারিক জীবনের ভারসাম্য। এইটাই জীবন···একটানা পরিবর্তন, এবং সে পরিবর্তনের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়া। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই দায়িত্ব বাড়ছে ক্রমে, বাড়ছে সমস্যা—দায়িত্ব বহন করছে তারা, সমাধান করছে একের পর এক সমস্যার—সাহায্য করছে পরস্পরকে, নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে আশ্চর্য সুন্দর এক মধুর সম্পর্ক। যতই পুরনো হচ্ছে, ততই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে একে অন্যের কাছে।

ঝগড়া-ফ্যাসাদ হবে না তা নয়—হবে। আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি,

বিশ্বাস ও অভ্যাসের দু'জন পূর্ণবয়স্ক মানুষ এক হচ্ছে, ঠোকাঠুকি আর গোলমাল ছাড়াই দু'জন একেবারে খাঁজে খাঁজে এক হয়ে মিলে যাবে এমন আশা করা বোকামি। বহু ব্যাপারেই আপোষ করতে হবে দুজনকে, শুধরে নেয়ার জন্যে জেদ না ধরে ছোটখাট ব্যাপারে যে-যেমন তাকে তেমনি ভাবেই মেনে নিতে হবে। খাওয়ার সময় হাপুস হুপুস শব্দ করা, জামাকাপড়ের ম্যাচ না বোঝা, পছন্দের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করা, বাচনভঙ্গিতে বিশেষ কোন মুদ্রাদোষ—এসব খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। ধর্মবিশ্বাস বা রাজনৈতিক মতাদর্শ, অবসর বিনোদনের উপায়, অথবা সন্তানদের মানুষ করবার ব্যাপারে মতপার্থক্য অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কিন্তু ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সাথে সমাধান খুঁজলে এসব ব্যাপারেও সুসমন্বয় সাধন সম্ভব।

অর্থনৈতিক অবস্থার উপর স্বামী স্ত্রীর মিল-মহব্বত অনেকখানি নির্ভর করে। বিশেষ করে যদি একভাবে চলতে চলতে হঠাৎ কোন গুরুতর আর্থিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হয়। হঠাৎ করে জীবন যাত্রার মান কমে বা বেড়ে গেলে তার সাথে তাল মিলিয়ে চলা মুশকিল হয়ে উঠতে পারে। এর ফলে অনেক সংসারে অনেক ধরনের কঠিন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, হচ্ছে, এবং হবে। এসব ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব মানিয়ে নিতে বলা ছাড়া আর কোন পরামর্শ নেই। সব ধরনের পরিবর্তনের সাথেই মানিয়ে নিতে হবে—সুখ, দুঃখ, সব।

বিচ্ছেদের কথা না বললে আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। স্বামী বা

স্ত্রীর মৃত্যু ঘটলে যে বিচ্ছেদের সূচনা হয় ছেলে-মেয়েদের উপর তার প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনাদর বা অতি আদর দুটোই ওদের জন্যে ক্ষতিকর। একজন মারা গেলে স্বাভাবিকভাবেই অপরজন নানান উপায়ে পূরণ করবার চেষ্টা করে সে অভাব। অতি-আদরে বখে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় ছেলেমেয়েদের মধ্যে। যদি মা অথবা বাবা আরেকটা বিয়ে করে তাহলে ছেলে-মেয়েদের মানুষ করবার জটিল সমস্যা জটিলতর হয়ে ওঠে। সৎ-মায়ের সাথে মানিয়ে নেয়া খুব একটা সহজ কাজ নয়। ঈর্ষা, বিরক্তি, দ্বৈতশাসন এবং ভিন্ন আচার-আচরণের ফলে যে মন কষাকষি সেটা তীব্র আকার ধারণ করতে পারে। ব্যাপারটা আরও তীব্র হয় যদি বিবাহবিচ্ছেদের ফলে ঘর ভাঙে। নতুন বাবা কিম্বা মায়ের সাথে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারে না তারা, আনুগত্য যদি অনুপস্থিত বাবা বা মায়ের প্রতি থেকে যায়। মোটকথা ঘর ভাঙলে এর পরিণাম কেবল স্বামী-স্ত্রী দু'জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে নিষ্পাপ সন্তানদের জীবনে।

কাজটা পুরুষদের জন্যে পাঁচ-দশ মিনিটের ব্যাপার, মেয়েদের জন্যেও আজকাল খুব একটা কঠিন কিছু না। বিয়েটা টিকিয়ে রাখা এবং সার্থক করে তোলাই কঠিন। আর এই কঠিন কাজের মধ্যেই রয়েছে সত্যিকার সুখ ও শান্তি। কলহ-বিবাদ বাধবেই, কিন্তু সদিচ্ছা থাকলে যে-কোন রকম কঠিন সমস্যার গঠনমূলক সমাধান বের করে নেয়া সম্ভব সামান্য কথা কাটাকাটি হতেই

মেয়ে ছুটলো বাপের বাড়ি, কিম্বা ছেলে রাত কাটাল বাইরে কোথাও—এসব সমাধানের পথ নয়। ওসব করে স্বামী বা স্ত্রীকে শিক্ষা দেয়া যায় না। ভাবাবেগ দমন করে এসব ক্ষেত্রে বুদ্ধির ব্যবহার করতে হবে। ঝগড়া হলে তার নিষ্পত্তিটা এমন হওয়া চাই যাতে দু'জনের বন্ধন ক্রমে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়।

আমার এক পাকিস্তানী বন্ধু, শরাফ আলী, ঢাকায় একটা দু'কামরার ফ্ল্যাটে থাকত স্ত্রীকে নিয়ে। মুরগী চালান দিত করাচিতে। কিছুদিন পর স্ত্রীর বখে যাওয়া এক ছোট ভাই এসে জুটলো তাদের সাথে—ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। একদিন দুপুরে অফিস থেকে বাসায় ফিরে শরাফ আলী শুনলো সিনেমা দেখার জন্যে দশটা টাকা চেয়ে পায়নি বলে আপার গায়ে হাত তুলেছে শ্যালকপ্রবর। খেপে গিয়ে ধুমধাম পিটিয়ে দিল সে শালাকে আচ্ছামত। এদিকে ভাইটার জন্যে কলজে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে বোনের। নালিশ করেছে বটে, কিন্তু তুই একটা ধমক দিলেই তো যথেষ্ট ছিল, দুটো খেতে দিচ্ছে বলেই কি বাপ-মরা ছেলেটাকে এমন মারধোর করবে গাড়োলের মত? এক কথায় দু'কথায় বেধে গেল ঝগড়া। আধঘণ্টার মধ্যে বাড়তে বাড়তে একেবারে চরমে পৌঁছে গেল কলহ—আজই টিকেট করে এনে দাও, আমি থাকব না তোমার কাছে, আজই চলে যাব আমি করাচিতে। ঠিক আছে—বলল আমার বন্ধু, তোমাকে বিদায় করতে পারলে আমার হাড়ে হাওয়া লাগবে, যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর, জিনিসপত্র বেঁধে-ছেঁদে তৈরি হয়ে নাও, নিয়ে আসছি

টিকিট। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেল শরাফ আলি। তিনটে বাজল, চারটে বাজল, পাঁচটা বাজল। শরাফ আলীর দেখা নেই। স্যুটকেস গুছিয়ে রেডি হয়ে বসে আছে শরাফ-গিন্নী, বারান্দায় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে শ্যালক—দু'জনেই বুঝে নিয়েছে এই যাওয়াই শেষ যাওয়া, দুপক্ষ থেকেই এত কটু কথা বলা হয়ে গেছে যে আর মিল হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। দাম্পত্য জীবনের এইখানেই সমাপ্তি। ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় দড়াম করে খুলে গেল ফ্ল্যাটের দরজা। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল গিন্নী: এনেছ টিকিট? গম্ভীর শরাফ আলীর কণ্ঠস্বর: এনেছি। পরবর্তী প্রশ্নটা করতে গিয়ে কেঁপে গেল শরাফ-গিন্নীর গলাটা: কই দেখি? বুক পকেট থেকে টান দিয়ে বের করল শরাফ আলী তিনটে টিকিট। সিনেমার। ছ'টার শো। প্রথমে থমকে গেল বিস্ময়ে, পরমুহূর্তে বুঝতে পারল গিন্নী ব্যাপারটা, হেসে উঠল পাগলের মত, তারপর স্বামীর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে না উঠে আর উপায় রইল না তার। মিনিট পনের পরে দেখি হাসতে হাসতে চলেছে তিনজন স্কুটারে করে মধুমিতার দিকে।

এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর সূক্ষ্ম রসবোধ থাকলে ত কথাই নেই—সব সমস্যা আপনার কাছে পানি। যদি ওদিক থেকে কমতি থাকে, ই. এম. ডুভাল তাঁর 'বিল্ডিং ইয়োর ম্যারেজ' গ্রন্থে ঝগড়া নিষ্পত্তির ব্যাপারে যে উপদেশ দিয়েছেন সেটা অনুসরণ করতে কারও খুব একটা অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

১। বিবাদকে মেনে নেয়া দরকার। মনে রেখো, স্বামী-স্ত্রীর

মধ্যে কলহ স্বাভাবিক ব্যাপার। মতবিরোধ থাকাটা দোষের কিছু নয়, লজ্জার ত নয়ই। মাঝে মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটির মাধ্যমে বরং দু'জন দু'জনকে আরও গভীরভাবে চিনবার সুযোগ হয়।

২। যে ব্যাপারে বিরোধ বাধছে সেটা তোমার স্বামী (বা স্ত্রী)-র কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বুঝবার চেষ্টা করো। নিজেকে যতটা সম্ভব না জড়িয়ে তার ব্যাখ্যাটা শুনবার এবং হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করো। তাকে প্রাণ খুলে কথা বলবার সুযোগ দাও। বলে ফেললে অনেকখানি বেরিয়ে যাবে ভাবাবেগের চাপা বাষ্প। বিচার-বুদ্ধি ও বিবেচনা ফিরে আসবে খুবই দ্রুত।

৩। তোমার কাছে এর গুরুত্ব কতখানি? তুমি বিরক্ত হচ্ছ কেন? নিজেকে প্রশ্ন করো, কেন উত্তেজিত বোধ করছ তুমি এই ব্যাপারে? সৎ ভাবে উত্তর খোঁজো এ প্রশ্নের। তোমার নিজের দোষ নেই ত?

৪। ব্যাপারটাকে সমস্যা সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবার চেষ্টা করো। তার কাছে জানতে চাও কিভাবে এর সমাধান হওয়া সম্ভব। মনের মধ্যে ভাবাবেগের চাপ জমতে না দিয়ে আলোচনার মাধ্যমে পরিষ্কার করে নাও প্রতিটা বিরোধ। দু'জ-নের পক্ষেই সহজে গ্রহণযোগ্য হয় এমন একটা সমাধানের দিকে এগোবার চেষ্টা করো।

৫। বিরোধ মীমাংসার ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ কি হবে স্থির করে নাও দু'জনে মিলে। সেইমত নেমে যাও কাজে যত শীঘ্রি সম্ভব।

৬। তোমার স্বামী (বা স্ত্রী)-র যদি ভুলও হয়, লক্ষ্য রেখ যেন তার মর্যাদার হানি না হয় ; তার মান বজায় রাখতে হবে। তাকে বুঝতে দিতে হবে, তার ভুল হোক আর যাই হোক, তোমার ভালবাসা যেমন ছিল তেমনি আছে। পরস্পরকে চিমটি কাটা থেকে বিরত থাকবে। সমস্যার প্রতি মনোযোগ দাও, একে-অন্যের দোষের প্রতি নয়।

৭। সহিষ্ণু হও। সমাধান খুঁজে বের করবার পিছনে সময় ব্যয় করতে দ্বিধা করো না। অলৌকিক কিছু ঘটবার আশায় কালক্ষেপ করো না। সমস্যার পিছনে সময় দিতে হয়।

৮। যদি মনে করো পরিস্থিতি তোমার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে তাহলে যোগ্য কোন লোকের সাহায্য নাও। দু'জনেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, সেই লোক যা বলবে, সেটা ভুল হোক বা ঠিক হোক, বিনা আপত্তিতে মেনে নেবে।

অটুট স্বাস্থ্যের জন্যে

নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে।

খুবই কঠিন কাজ। পরামর্শটা সুকোমল শান্তিপ্রিয় বাঙালীর জন্যে আঁতকে ওঠার মতই। কিন্তু ব্যায়াম সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণাটা একটু বদলে নিলে দেখবেন পানির মত সহজ হয়ে গিয়েছে। মোটেই কঠিন বা কষ্টকর লাগছে না।

ব্যায়াম করা ভাল, আমরা সবাই জানি। কিন্তু ঠিক কি উপকার হয় জানি না। তাছাড়া কোন্ ধরনের ব্যায়াম কতক্ষণ করলে সুস্থ ও সবল থাকার জন্যে যথেষ্ট, তাও জানা নেই আমাদের। তার উপর রয়েছে লোক-লজ্জা। সেই সাথে বদ্ধমূল ধারণা : বেশ ত আছি, অসুখ-বিসুখ হচ্ছে না, কি দরকার পালোয়ান বা বডি বিল্ডার হয়ে?

প্রথমেই বলে রাখা দরকার, ডাম্বেল, বারবেল, প্যারালেল বার ইত্যাদি; কিংবা বুকডন, বৈঠক, যোগাসন ইত্যাদি ব্যায়াম শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি ও বিশেষ বিশেষ পেশীর দৃঢ়তার জন্যে খুবই ভাল—কিন্তু আমরা আপাততঃ এগুলোকে আলোচনার বাইরে

পাবেন। এসব ব্যায়াম আপনাকে endurance বা অনেকক্ষণ ধরে একটানা পরিশ্রম করবার ক্ষমতা দেবে না। তাছাড়া সব বয়সের মানুষের পক্ষে এসব ব্যায়াম করা সম্ভবও নয়। আপনার এমন ব্যায়াম শুরু করা উচিত যেটা নব্বই বছর বয়স পর্যন্ত অনায়াসে চর্চা করতে পারেন। এমন ব্যায়াম, যেটা আজ থেকে শুরু করতে পারেন আপনি, আপনার বয়স বার হোক বা পাঁচ বারং ষাট হোক—অসুবিধে নেই।

কেন ব্যায়াম করব—এটাই আসলে প্রথম প্রশ্ন। কি উপকার হবে আমার ব্যায়াম করলে? কি ক্ষতি হচ্ছে না করলে?

এটা জানা ছিল না বলেই নিয়মিত ব্যায়াম করিনি আমি জীবনে কোনদিন। ছোট বেলায় খেলা-ধুলো করেছি, মাঝে মাঝে মনের মধ্যে মিস্টার ঢাকা হবার বাসনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে হপ্তাখানেক বিপুল বিক্রমে ডন বৈঠক দিয়ে পেশীর উপর অত্যাচার করেছি—কিন্তু উৎসাহ ধরে রাখতে পারিনি। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই বেশ নধর একটা আধমণী ভুঁড়ি গজিয়ে নিয়ে সেটা বয়ে বেড়াচ্ছিলাম মনের সুখে। ঠিক সেই সময় হল আমি ক্র্যাক ডাউন। একাত্তরের পঁচিশে মার্চ।

নিজের অক্ষমতা টের পেলাম হাড়ে হাড়ে। পঞ্চাশ গজ দৌড়োবার ক্ষমতাও নেই তখন আমার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান তো দূরে [illegible], আধ মাইল হাঁটলেই জিভ বেরিয়ে আসতে চায়। হাল ছে[illegible]ড়ে দিলাম। ধরে নিলাম বার্ধক্য এসে গেছে, আর কে[illegible] পাব না ছেলেবেলার সেই সহজ, স্বচ্ছন্দ

কর্ম চাঞ্চল্য; এবার ধীরে ধীরে ঢলে পড়বো চূড়ান্ত অক্ষমতার দিকে। শেষ হয়ে গেছি আমি।

এমনি সময়ে হঠাৎ একটা বিদেশী পত্রিকায় ডক্টর কেনিথ এইচ. কুপারের 'হাউ টু ফিল ফিট অ্যাট এনি এজ' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে পেয়ে গেলাম আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ। কেন ব্যায়াম করব?—এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ভদ্রলোক। খুবই সহজ কথা, কিন্তু বুঝিয়ে দিলে সোজা, নইলে কঠিন—অনেকটা ভোজবাজির মত।

কুপার বলছেন, সবচেয়ে ভাল স্বাস্থ্যের লক্ষণ হচ্ছে একনাগাড়ে অনেকক্ষণ ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করবার ক্ষমতা থাকা। এই ক্ষমতা অর্জন করবার চাবি-কাঠি হচ্ছে অক্সিজেন।

যে কোন রকমের শারীরিক কার্যকলাপের জন্যে, এমন কি শ্বাস-প্রশ্বাসে, হজম ও হৃৎস্পন্দনের জন্যেও চাই এনার্জি বা শক্তি। এ শক্তি আসে কোথা থেকে? মানুষের শরীর খাদ্যকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে তৈরি করে এই শক্তি। আগুনের কাজ করে অক্সিজেন। শরীরের মধ্যে খাদ্য জমা রাখার ব্যবস্থা আছে। আমরা যা খাই সেটা প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করছে আমাদের দেহ, কিছুটা আবার জমিয়েও রাখছে ভবিষ্যতের জন্যে। কিন্তু অক্সিজেন জমা রাখার কোন ব্যবস্থা নেই। এখানে নগদ কারবার। প্রতিনিয়ত শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে যে অক্সিজেন আসছে শরীরে, তাই ভরসা। এই সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলেই থেমে যাবে দেহ নামধারী এই বিচিত্র যন্ত্রটা।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, বেশি অক্সিজেনের দরকার হলে বেশি করে শ্বাস নিলেই ত ঢুকে যায়, সমস্যা কিসের? সমস্যা আছে। সেটা হচ্ছে, শক্তি তৈরি করার জন্যে রক্তের সাথে মিশে অসংখ্য সূক্ষ্ম রক্তনালী বেয়ে যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেনকে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জমে থাকা খাদ্যের কাছে পৌঁছতে হবে। পৌঁছতেই যদি না পারে তাহলে দুইয়ে মিলে শক্তি তৈরির প্রশ্নই ওঠে না।

দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ কাজকর্ম করার জন্যে যে শক্তি দরকার, আমরা সবাই মোটামুটি সেইটুকু তৈরি করতে পারি অনায়াসেই। কিন্তু শারীরিক কাজের চাপ যদি কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়া যায় তাহলে অনেকেই সহ্য করতে পারি না সেটা, ক্লান্ত হয়ে পড়ি, অবসাদে অবশ হয়ে আসে শরীর। এর কারণ, অনভ্যাসের ফলে অক্সিজেন আত্মস্থ করা এবং প্রয়োজন হলেই জায়গা মত পৌঁছে দেয়ার ক্ষমতা আমাদের সংকীর্ণ হয়ে গেছে।

কাজেই নিয়মিত এমন কিছু ব্যায়াম করা উচিত, যেটা করতে গেলে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন প্রয়োজন হয়, এবং সেটা সংগ্রহ করে সরবরাহ করতে বাধ্য হয় আমাদের শরীর। নিয়মিত কিছুদিন চর্চা করলেই অদ্ভুত সব পরিবর্তন ঘটবে শরীরের অভ্যন্তরে, অনেক রোগ সেরে যাবে আপনাআপনি।

কয়েক ধরনের ব্যায়ামের কথা বলব, কিভাবে শরীরটাকে সইয়ে নিয়ে এগোতে হবে পূর্ণমাত্রার দিকে সেটাও বলব, কিন্তু তার আগে দেখা যাক এই ব্যায়ামে কি কি উপকার পাওয়া যাচ্ছে।

১। বাতাস থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করবার ক্ষমতা বাড়ছে ফুসফুসের।

২। হৃৎপিণ্ড শক্তিশালী হচ্ছে, প্রতিটি স্পন্দনে বেশি রক্ত সরবরাহ করছে। ফলে কম স্পন্দনেই কাজ চলছে। বিশ্রাম পাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা। আগের চেয়ে স্পন্দন কমে যাচ্ছে প্রতি মিনিটে বিশটা করে—দিনে বেঁচে যাচ্ছে ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার স্পন্দন।

৩। শরীরের সর্বত্র রক্তবাহী নালীর আকার ও সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। অসংখ্য অকেজো রক্তনালীর মুখ খুলে গিয়ে রক্ত চলাচল বাড়ছে, ফলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পেশীতে গিয়ে পৌছতে পারছে অক্সিজেন। রক্তের পরিমাণও বাড়ছে। কারও কারও ক্ষেত্রে তিন পোয়া (!) পর্যন্ত বেড়ে যায় রক্ত।

৪। হৃদরোগের সম্ভাবনা কমছে।

৫। পেশীর দৃঢ়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রক্তসঞ্চালন সুষ্ঠ হচ্ছে। ব্লাড প্রেশার কমছে।

৬। পেটের গোলমাল দূর হচ্ছে। হজম শক্তি বাড়ছে।

৭। অক্লান্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা আসছে।

৮। চর্বির আতিশয্য দূর হয়ে যাচ্ছে।

কাজেই চর্চা শুরু করলাম। আজ পাঁচ বছর পর অতীতের কথা ভেবে হাসি পায় আমার। ভুঁড়ি গায়েব হয়ে গেছে বেমালুম। ইচ্ছে করলেই একটানা চার-পাঁচ মাইল দৌড়ে চলে যেতে পারি। আবার জীবনের হাল ধরেছি শক্ত হাতে। বুঝতে পেরেছি,

বার্ধক্য আসতে বহু দেরি আছে এখনও। ছেলেবেলার উদ্যম, উৎসাহ, কর্মতৎপরতা ফিরে এসেছে আবার।

আপনিও এই ব্যায়াম থেকে উপকার পেতে পারেন। এগুলো নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, সবার জন্যে।

আপনার বয়স নয় হোক বা নব্বই হোক, আপনি মেয়ে হন বা পুরুষ হন, নিম্নলিখিত ব্যায়ামগুলোর যে কোন একটি বা দুটি অভ্যাস করতে পারেন বিনা দ্বিধায়। রোগ-বালাই থাকলে অবশ্য চর্চা করবার আগে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়াই উচিত, কিন্তু অনেক বয়স হয়ে গেছে মনে করে যদি বিরত থাকেন, তাহলে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। যে কোন বয়সেই শুরু করা যায় এইসব ব্যায়াম।

আগেই বলা হয়েছে, এমন ব্যায়াম করতে হবে যার ফলে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন সংগ্রহ করতে বাধ্য হয় ফুসফুস, প্রয়োজনীয় এলাকায় সেটা দ্রুত সরবরাহ করতে বাধ্য হয় হৃৎপিণ্ড, এবং ঠিক কতটা করলেই যথেষ্ট হচ্ছে জানতে পারছেন আপনি পরিষ্কার।

এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল হচ্ছে দৌড়, তারপর সাঁতার, সাই-কেল চালনা, হাঁটা এবং একজায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়ের মত লাফান, কিম্বা স্কিপিং। এক এক করে প্রত্যেকটির উপকারিতা, নিয়ম, পরিমাণ ও পূর্ণ মাত্রা বর্ণনা করে যাচ্ছি, আপনার পছন্দ মত যে কোন একটি বেছে নিয়ে বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু করে দিন আজ থেকেই। কোন ব্যায়ামের ব্যাপারেই দয়া করে একদিনেই পূর্ণ মাত্রা অর্জন করবার চেষ্টা করবেন না। তিন মাসের প্রোগ্রাম নিয়ে ধীরে সুস্থে সইয়ে নিতে হবে শরীরটাকে। সপ্তাহে অন্তত

পাঁচ দিন ব্যায়াম করতে হবে। ছয়দিন করতে পারলে আরও চমৎকার।

শ্রেষ্ঠ ব্যায়াম। দ্রুত উন্নতির জন্যে চমৎকার। নিখরচা। শরীরের সর্বত্র পেশীর দৃঢ়তা বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু বিশেষ ভাবে উপকার পাবেন হাত, পা এবং তলপেটে। ঘরের ভিতরও দৌড়াতে পারেন, তবে সবচেয়ে ভাল হয় যদি বাইরে খোলা মাঠের উন্মুক্ত বাতাসে দৌড়ান। প্রথম দু'মাস রোজ এক মাইল করে দৌড়াবেন। প্রথম দিন সাড়ে তের মিনিটে এক মাইল যাবেন (অর্থাৎ প্রায় হাঁটার মতই গতি হবে আপনার)। ক্রমে গতিবেগ বৃদ্ধি করতে হবে। দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিন এক মাইল যাবেন দশ মিনিটে, পঞ্চদশ দিন নয় মিনিটে। ষষ্ঠদশ দিন থেকে দ্বিতীয় মাসের শেষ দিন পর্যন্ত দেড় মাইল দৌড়াতে হবে পনর মিনিটে। তৃতীয় মাসের প্রথম দিন দেড় মাইল দৌড়াবেন চোদ্দ মিনিটে। ক্রমে দৌড়ের গতিবেগ বাড়াতে বাড়াতে তৃতীয় মাসের শেষ দিন দেড় মাইল দৌড়াবেন সাড়ে বার মিনিটে। এটাই আপনার পূর্ণ মাত্রা। এর পর থেকে প্রতি সপ্তাহে অন্তত পাঁচ দিন হয় এক মাইল দৌড়াবেন সাত মিনিটে, নয়তো দেড় মাইল দৌড়াবেন সাড়ে বার মিনিটে, কিম্বা দু'মাইল দৌড়াবেন সতের মিনিটে। যেমন খুশি।

সাঁতার

দৌড়ের পরই সাঁতারের স্থান। শরীরের বড় বড় পেশীগুলোর ব্যায়াম হয় সাঁতারে, বিশেষ করে হাত ও পায়ের পেশী খুবই দৃঢ় হয়। সাঁতার বলতে আমরা ফ্রি স্টাইল সাঁতার বুঝব।

প্রথম মাসের প্রথম দিন একশো গজ দুরত্ব সাঁতার কাটবেন আড়াই মিনিটে। ক্রমে গতি ও দুরত্ব বাড়াতে থাকবেন। মাসের শেষ দিন আড়াইশো গজ যেতে হবে আপনার পাঁচ মিনিটে। দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিন তিনশো গজ যাবেন ছয় মিনিটে, পঞ্চদশ দিনে চারশো গজ যেতে হবে সাড়ে আট মিনিটে। দ্বিতীয় মাসের ষষ্ঠদশ দিন পাঁচশো গজ যাবেন সাড়ে দশ মিনিটে, এবং শেষ দিন ছয়শো গজ যাবেন সাড়ে বার মিনিটে। তৃতীয় মাসের প্রথম দিন সাতশো গজ যাবেন ষোল মিনিটে। ক্রমে গতিবেগ ও দুরত্ব বাড়িয়ে তৃতীয় মাসের শেষ দিন আটশো গজ যাবেন ষোল মিনিটে। এটাই আপনার পুর্ণ মাত্রা। এর পর থেকে প্রতি সপ্তাহে অন্তত পাঁচ দিন হয় ছয়শো গজ সাঁতার কাটবেন এগার মিনিটে, নয়ত আটশো গজ সাঁতার কাটবেন ষোল মিনিটে, কিম্বা এক হাজার গজ সাঁতার কাটবেন বাইশ মিনিটে। যে কোন একটা বেছে নিয়ে চালিয়ে যান।

সাইকেল চালনা

সাইকেলের অসুবিধে হচ্ছে, একটা সাইকেল সংগ্রহ করতে হবে, আর ঝড় বৃষ্টির দিনে অত্যন্ত বেকায়দা অবস্থায় পড়তে হবে।

তাছাড়া এতে শরীরের উপরের অংশের পেশীগুলো তেমন দৃঢ় হয় না যদিও পা এবং কোমর খুবই শক্তিশালী হয়। যাই হোক, এই ব্যায়ামে শরীরের অভ্যন্তরীণ উপকার দৌড় বা সাঁতারের সমানই।

প্রথম মাসের প্রথম দিন দুই মাইল যাবেন আট মিনিটে, ক্রমে গতিবেগ ও দূরত্ব বাড়িয়ে মাসের শেষ দিন তিন মাইল যাবেন দশ মিনিটে। দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিন তিন মাইল যাবেন সোয়া নয় মিনিটে, পঞ্চদশ দিন চার মাইল যাবেন সাড়ে বার মিনিটে। দ্বিতীয় মাসের ষষ্ঠদশ দিনে পাঁচ মাইল যাবেন সতের মিনিটে, শেষ দিন পাঁচ মাইল যাবেন ষোল মিনিটে। তৃতীয় মাসের প্রথম দিন ছয় মাইল যাবেন উনিশ মিনিটে, শেষ দিন আট মাইল যাবেন আটাশ মিনিটে। এটাই আপনার পূর্ণ মাত্রা। এর পর থেকে প্রতি সপ্তাহে অন্তত পাঁচ দিন হয় ছয় মাইল যাবেন একুশ মিনিটে, নয়ত আট মাইল যাবেন আটাশ মিনিটে, কিম্বা দশ মাইল যাবেন চল্লিশ মিনিটে। আপনার সুযোগ সুবিধে বুঝে যে কোন একটা নিয়ম বেছে নিন।

চেষ্টা করবেন পূর্ণ দূরত্বকে দুই ভাগে ভাগ করে নিয়ে অর্ধেক বাতাসের অনুকূলে এবং বাকি অর্ধেক বিপরীতে সাইকেল চালাতে।

টা

এতে পায়ের পেশীই কেবল দৃঢ় হচ্ছে। সময় বেশি লাগছে।

কিন্তু সুবিধে হচ্ছে, দিনের যে কোন সময় করা যায় এই ব্যায়াম, অথচ ঠিক ব্যায়ামের মত দেখায় না। অভ্যন্তরীণ উপকারিতা অন্যান্য ব্যায়ামের সমানই।

প্রথম মাসের প্রথম দিন শুরু করুন এক মাইল পনের মিনিটে হেঁটে। ক্রমে গতিবেগ ও দূরত্ব বাড়িয়ে মাসের শেষ দিন দেড় মাইল হাঁটবেন একুশ মিনিটে। দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিন দুই মাইল হাঁটুন ত্রিশ মিনিটে, পঞ্চদশ দিন দুই মাইল হাঁটুন সাড়ে সাতাশ মিনিটে। দ্বিতীয় মাসের ষষ্ঠদশ দিনে আড়াই মাইল হাঁটুন পঁয়ত্রিশ মিনিটে। এবং শেষদিন আড়াই মাইল হাঁটুন তেত্রিশ মিনিটে। তৃতীয় মাসের প্রথম দিন তিন মাইল হাঁটুন তেতাল্লিশ মিনিটে। ক্রমে গতিবেগ ও দূরত্ব বাড়িয়ে তৃতীয় মাসের শেষ দিন চার মাইল হাঁটুন এক ঘণ্টায়। এটাই আপনার পূর্ণ মাত্রা এর পর থেকে প্রতি সপ্তাহে অন্তত পাঁচ দিন হয় তিন মাইল হাঁটুন চল্লিশ মিনিটে, নয়ত চার মাইল হাঁটুন এক ঘণ্টায়, কিম্বা পাঁচ মাইল হাঁটুন বাহাত্তর মিনিটে।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়ের মত লাফান

এতে উপকার অন্যান্য সবগুলোর সমানই। সুবিধে হচ্ছে, বৃষ্টি-বাদলার দিনে অন্য ব্যায়ামের বদলে অনায়াসে এটা দিয়ে কাজ চালিয়ে নেয়া যায়। আরও একটা সুবিধে, লাজুক মানুষকে ঘরের বাইরে যেতে হয় না। এতে দৌড়ের মতই হাত, পা ও তলপেটের পেশী দৃঢ় হয়। নিয়ম হচ্ছে, মাটি থেকে অন্তত আট ইঞ্চি তুলতে

হবে না ; এবং প্রতি মিনিটে সত্তর থেকে আশিবার বাম পা মাটি স্পর্শ করবে।

প্রথমে মাসের প্রথম দিন আড়াই মিনিট দিয়ে শুরু করুন। প্রতি পনের দিন অন্তর অন্তর বাড়িয়ে চলুন আড়াই মিনিট করে। তাহলে দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিন করছেন সাড়ে সাত মিনিট, তৃতীয় মাসের প্রথম দিন করছেন সাড়ে বার মিনিট। এবং তৃতীয় মাসের শেষ দিন করছেন পনের মিনিট। এর সাথে আরও আড়াই মিনিট যোগ করে নিয়ে সাড়ে সতের মিনিট হচ্ছে আপনার পূর্ণ মাত্রা। এর পর থেকে প্রতি সপ্তাহে অন্তত পাঁচ-দিন সাড়ে সতের মিনিট ধরে এক জায়গায় দৌড়ের মত লাফাতে থাকুন।

স্কিপিং এর বেলাতেও এই একই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

মনে রাখবেন, ব্যায়ামের পর পরই ঘুমাতে যাবেন না কখনও —অন্তত এক ঘণ্টা সময় দিতে হবে পেশীগুলোকে আড়ষ্টতা দূর করার জন্যে।

প্রতিটি ব্যায়ামই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একনাগাড়ে করতে হবে, মাঝে থেমে খানিক জিরিয়ে নিলে চলবে না। দিনের যে কোন সময়ে ব্যায়াম করতে পারেন, কিন্তু ভাত খাওয়ার পর দু'-ঘণ্টার মধ্যে করবেন না। প্রথম প্রথম শরীরের বিভিন্ন পেশীতে অল্প-বিস্তর ব্যথা হবে, একটু সহ্য করে নিতে হবে, কদিন পর আপনিই চলে যাবে। ব্যায়ামের যে পরিমাণ বেঁধে দেয়া হয়েছে সেটা আমার খেয়াল খুশি অনুযায়ী দেয়া হয়নি, বহু গবেষণার

পর এসব নির্ধারিত হয়েছে মার্কিন এয়ারফোর্সের রিসার্চ সে-ন্টারে। তারই উপর ভিত্তি করে প্রতিটা ব্যায়ামের পরিমাণ নির্ধা-রণ করেছি যথেষ্ট সময় ব্যয় করে ; কাজেই দয়া করে অতি উৎ-সাহিত হয়ে দ্রুত উন্নতির চেষ্টা করবেন না—পস্তাবেন। ধীর অথচ নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলে এবং চতুর্থ মাস থেকে নিয়মিত পূর্ণ মাত্রায় ব্যায়াম করতে থাকলে আজ থেকে ছয় মাসের মধ্যে আপনি সুস্থ সবল, প্রাণবন্ত এক আলাদা মানুষ হয়ে যাবেন—কথাটা লিখে দিতে পারি। পাঠিকাদেরকেও কথা দিতে পারি, যদি তাঁদের ফিগার আগের চেয়ে অন্তত দ্বিগুণ সুন্দর না হয়, কান কেটে ফেলব।

শেষ করার আগে আর একটি কথা। ব্যায়াম শুরু করবার কিছুদিনের মধ্যেই হঠাৎ মনের মধ্যে প্রশ্ন উদয় হবে, কেন শুধু শুধু ব্যায়াম করছি। বেশ ত ছিলাম, কেন বেহুদা কষ্ট করছি। সবারই হয় এরকম। প্রশ্নটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে আর কিছুদিন নিয়মিত চালিয়ে গেলেই দেখবেন আবার উৎসাহ ফিরে এসেছে। নিজের আয়েশী মনের কুমন্ত্রণায় কান দেবেন না। দয়া করে থামিয়ে দেবেন না মাঝপথে।

আসুন না, আমরা সব বাঙালী অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হই?

ফলিত মনোবিজ্ঞান

আমার এক বন্ধুর পুরো একটা আলমারি ঠাসা রয়েছে 'হাউ টু' এবং 'সেল্‌ফ ইমপ্রুভমেণ্ট' সিরিজের বই দিয়ে। প্রচুর পড়েছেন তিনি এসব বিষয়ে। কি করে জনপ্রিয় হওয়া যায়, কি করে সাফল্য আসবে জীবনে, কি করে আত্মপ্রত্যয়ী হবেন, কি করে স্মৃতিশক্তি বাড়াবেন, কি করে ভয় দূর করতে হয়, ওষুধ না খেয়েও ঘুমান যায়, যৌনসমস্যার সমাধান করা যায়, আত্মসম্মোহন ও অটো-সাজেশনের সাহায্যে নিজের অবচেতন মনকে বশ করা যায়, হীন-মন্যতা ও লজ্জা দূর করা যায়, স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা করা যায়, জন-সভায় বক্তৃতা করা যায়—মোট কথা, হাজার পদের বই রয়েছে তাঁর কাছে। একটা বই দেখলাম: সিক্রেট অফ সিক্রেট্‌স্‌—না কিনে উপায় আছে?—একেবারে গূঢ় গোপন কথা প্রকাশ করে দিয়েছেন লেখক।

কয়েক বছর আগে নাকি একটা মানসিক ব্যাধির বই হাতে পড়েছিল আমার বন্ধুর। সেই বইয়ে বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগের কথা পড়েছিলেন তিনি: নিউরসিস, স্কিযোফ্রেনিয়া,

ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ সাইকোসেস্, মেলাংকোলিয়া, প্যারানোইয়া আরও কত কি। নিউরসিসের মধ্যে কত ভাগ রয়েছে আবার: অ্যাংযাইটি নিউরসিস, ফোবিক নিউরসিস; অবসেসিভ কমপালসিভ নিউরসিস, হিস্টেরিকাল নিউরসিস, হাইপোকন্ড্রিয়াকাল নিউরসিস, নিউরাসথেনিক নিউরসিস, ডিপ্রেসিভ নিউরসিস—এমন কি ইদানীং নাকি এগজিস্ট্যান্‌শিয়াল নিউরসিস বলে আরেক ধরনের রোগ বের করা হয়েছে। যাই হোক, বন্ধু যে রোগের কথাই পড়েন, সেটাই তাঁর কাছে মনে হয় তাঁর আছে। অনেক লক্ষণ মিলে যায় হুবহু। এটা যে সবার জন্যেই সত্য, আসলে সবার মধ্যেই সব রোগের জীবাণু থাকতে পারে, বেশি হয়ে গেলেই সেটা রোগের আকার ধারণ করে, অন্যথা এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করবার কিছুই নেই; এ কথা জানা ছিল না বন্ধুর। তিনি ধরে নিলেন স্বাভাবিক মানুষ তিনি নন, কঠিন ব্যাধি আছে তাঁর মনের মধ্যে। এমনি সময়ে হাতে পড়ল 'হাউ টু কিওর ইয়োর নার্ভস্ ইয়োরসেলাফ্' নামে একটা বই। এই হল শুরু। তারপর একের পর এক বই কিনে গেছেন তিনি পাগলের মত।

জিজ্ঞেস করে জানা গেল, এসব বই পড়ে তিনি নাকি জানতে পেরেছেন যে, তাঁর মধ্যে প্রচণ্ড এক ক্ষমতা রয়েছে, রয়েছে বিরাট কোন সম্ভাবনার ইঙ্গিত, ইচ্ছে করলেই মস্ত কিছু হয়ে যেতে পারেন তিনি। প্রতিটা বইয়েই রয়েছে এই ধরনের প্রচুর আশ্বাসবাণী—কিন্তু আদতে যা ছিলেন তাই রয়ে গেছেন তিনি, মাঝখান দিয়ে প্রচুর টাকা বেরিয়ে গেছে এসব বই কেনার পিছনে।

বইয়ের কিছু কিছু কৌশল প্রয়োগ করতে গিয়ে বন্ধু-বান্ধবের কাছে টিটকারির পাত্র হয়েছেন, 'ডেল কার্ণেগী' আখ্যা পেয়েছেন, অনেক জটিল মানসিক সমস্যা নিয়ে ভেবে ভেবে মাথার চুল পাকিয়েছেন, লাভ হয়নি কিছুই।

কারণটা কি? এ সবই কি বাজে বই? শুধু অর্থোপার্জনের জন্যে লিখেছেন বড় বড় লেখকরা? বাট্রেঁ'ও রাসেলের মত ডাকসেটে দার্শনিকও ত সাধারণ মানুষের উপযোগী করে লিখেছেন 'দা কংকোয়েস্ট অভ হ্যাপিনেস'—এটাও কি নিছক অর্থোপার্জনের জন্যেই? এসব বইয়ে কারও কোন উপকার হয় না?

তা কিন্তু নয়। অনেক বাজে বই আছে, সন্দেহ নেই, কিন্তু ভাল বইও আছে। আমার বন্ধু কেবল একের পর এক বই-ই পড়ে গেছেন, বিদ্যা অর্জন করেছেন, কিন্তু নিজের জীবনে তার প্রয়োগ করতে পারেননি। অনেক ব্যাপারে ধারণা অনেক পরিষ্কার হয়েছে, কিন্তু কিভাবে যে এসবকে কাজে লাগাবেন, ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারেননি। প্রতিটা পাঠকের ব্যক্তিগত সমস্যা লেখকের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, তাই তিনি মোটামুটি কিছু মূলতত্ত্ব আর কিছু উদাহরণ দিয়েই আশা করেছেন, পাঠকেরা এসব তত্ত্ব নিজের জীবনের বিশেষ বিশেষ সমস্যার ক্ষেত্রে কেমন ভাবে প্রয়োগ করে উপকৃত হতে পারবে সেটা নিজেরাই চিন্তা করে বের করে নেবে। কিন্তু সেটা সবার পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় না। গোড়ায় কিছুটা হাতে কলমে না শিখলে এগোন মুশকিল। ছ'টা কাঠি থেকে দুটো তুলে নিলে চারটে থাকে, এই চারটের সাথে আরও

চারটে যোগ করলে আটটা হয়—এ কথা আমি বিশ্বাস করি। গুণে দেখেছি, সত্যিই তাই হয়। একটা লাইন পেলাম। এরপর ধাপে ধাপে এগিয়ে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসে পৌঁছে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব।

থিওরি দরকার। কিন্তু হাতে কলমেও শিখে নিতে হবে আমাদের বেশ কিছুটা। একটা লাইনে আনতে হবে নিজেদের, তারপর দেখা যাবে সব থিওরি হয়ে পড়েছে জলবৎ তরলং। মনোবিজ্ঞান মন নিয়ে কারবার করে বলে যে একে সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে বায়বীয় আকার নিয়ে থাকতে হবে, সীমাবদ্ধ থাকতে হবে পুঁথির মধ্যেই, তা নয়। অন্যান্য বিজ্ঞানের মতই একে বাস্তবে প্রয়োগ করে উপকৃত হওয়া সম্ভব। নানান ধরনের গবেষণার মাধ্যমে মানুষের মনের অনেক বিস্ময়কর গোপন রহস্য আবিষ্কার করেছেন বৈজ্ঞানিকেরা। এগুলো জানা ও শেখা থাকলে নিজের জীবনে ব্যবহার করে যে-কোন মানুষ তার দক্ষতা, যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা কয়েকগুণ বাড়িয়ে নিতে পারবে। যে-সব সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে সে-সব যদি সততার সাথে ঠিক ঠিক কাজে লাগান যায় তাহলে যে বাস্তব-জ্ঞান লাভ করব সেটাই হবে আমাদের আসল ভিত্তি, তারপর কে কত গভীরে প্রবেশ করবে সেটা নির্ভর করবে ব্যক্তিগত অভিরুচির উপর।

এখানে আমরা নিজের জীবনে কিভাবে ফলিত মনোবিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে ইপ্সিত পরিবর্তন ঘটাতে পারি তাই নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখতে চাই। প্রথম দর্শনে একেকটা গবে-

ঘণার ফসলকে নেহাতই সাদামাঠা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তাই বলে গুরুত্ব না দেয়াটা খুবই বোকামি হবে। আমাদের নিত্য-কার কাজে কর্মে ছোটখাট অনেক ভুল থেকে যায়, সাধারণতঃ তেমন কোন গুরুত্ব দিই না, কিন্তু এসব যে আমাদের উন্নতির পথে কত বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, এবং এসব সহজ সাধা-রণ ভুলগুলো শুধরে নিলে, সেইসাথে নতুন কয়েকটা অভ্যাস গড়ে নিলে যে কত দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব সেটা নিজেরাই টের পাব আমরা, যদি প্রতিটা তথ্যকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিই।

স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধের সময় একবার খুব দ্রুত কয়েকশো টন লোহা ট্রেনে তোলার দরকার হয়ে পড়েছিল। কাজটা এমনই যে বেশি লোক লাগানর কোন উপায় ছিল না। সারাদিন হাড়-ভাঙা খাটুনি খেটে মজুররা সতের টন করে তুলছিল ট্রেনে। অথচ আরও দ্রুত কাজ হওয়া দরকার। ডাকা হল একজন অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজিস্টকে। কাজ দেখে তিনি বললেন, ভুল নিয়মে কাজ করছে ওরা, অনর্থক ক্লান্ত করছে শরীরটাকে—প্রতি বারো মিনিট কাজ করবার পর তিন মিনিট করে বিশ্রাম নেয়া উচিত প্রত্যে-কের। ঠিক হল, বার মিনিট কাজ হলে ফোরম্যান একটা হুইস্‌ল বাজাবে—ওমনি যার হাতে যা বোঝা আছে নামিয়ে রেখে তিন মিনিট বিশ্রাম নেবে সবাই, ঠিক তিন মিনিট পর হুইস্‌ল বাজলেই আবার শুরু হবে কাজ। মজুররা ত হেসেই খুন। এ ত আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে। বিদ্যান লোকেরা একটু বিদঘুটে

হয়, শুনেছে ওরা, এইবার সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। প্রাণ খুলে হাসল ওরা। বাবা, বিদ্যান আছ, ভাল কথা…যাও পুঁথি পড় গিয়ে, এসব খাটাখাটুনির কাজের মধ্যে আবার নাক গলানো কেন?

পরদিন নতুন নিয়মে শুরু হল কাজ। পঁয়তাল্লিশ টন তুলল ওরা সারাদিনে। অথচ সময় যে বেশি লেগেছে তাও নয়। বরং যতক্ষণ কাজ করবার কথা তার পাঁচ ভাগের একভাগ সময় বিশ্রাম নিয়েছে ওরা। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কাজ ও বিশ্রামের ধারাটা সামান্য একটু পরিবর্তন করে নেয়ায় প্রায় তিন গুণ এগিয়েছে কাজ।

শুধু শারীরিক পরিশ্রমের বেলাতেই নয়, মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে যেসব তথ্য উদঘাটিত হয়েছে সেসব আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানান কাজে লাগিয়ে নানান দিকে অনেক উপকার পেতে পারি। যে নিয়মে চলছি সেটাকে সামান্য কিছুটা এদিক কিম্বা ওদিক করে নিয়ে নিজেকে কয়েকগুণ বেশি ক্ষমতাশালী করে তুলতে পারি। কিভাবে বেশি ধান উৎপাদন করা যায়, ড্যাম তৈরি করে সস্তা বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, কম খরচায় মজবুত পাকা বাড়ি তৈরি করা যায়, ইত্যাদি ব্যাপারে আমরা সচেষ্ট, বৈজ্ঞানিকদের পরামর্শ অনুসরণ করতে আগ্রহী, তেমনি নিজের ব্যক্তিগত উন্নতির ব্যাপারে মনোবিজ্ঞানীদের পরামর্শ যদি একটু কান পেতে শুনি, ক্ষতি হবে না।

ফ্র্যাংক বি. গিলব্রেথ দেখলেন বাড়ি বানাতে গিয়ে রাজমিস্ত্রীরা

অনর্থক শক্তির অপচয় করছে। এই কথা বলায় বিনা দ্বিধায় তারা তাঁকে শিক্ষিত গর্দভ টাইটেল দিয়ে দিল। তাদের বক্তব্য : পুরুষানুক্রমে এই কাজ করছি আমরা, আমরা জানি না কি করে ইট গাঁথতে হয়, কয়েক পাতা এ বি সি ডি পড়েই রাজমিস্ত্রীর গুরু হয়ে বসেছে এ কোন্ মাতব্বর! একটা মুভি ক্যামেরা এনে রাজমিস্ত্রীদের কাজের ছবি তুললেন গিলব্রেথ, ল্যাবরেটরীতে ফিরে গিয়ে পরীক্ষা করলেন গভীর মনোযোগের সাথে, তারপর জোরের সাথে বললেন : তোমরা একটা ইট গাঁথতে গিয়ে আঠার বার অঙ্গ-চালনা করছ, কিন্তু এত সময় ও শক্তি ব্যয় করে তোমরা যে কাজটা করছ সেটা মাত্র পাঁচটা মুভমেন্টেই সম্ভব। তারা বলল : ঠিক আছে, দেখিয়ে দাও কিভাবে সম্ভব সেটা? তিনি দেখিয়ে দিলেন। যারা মেনে নিল, তিনগুণ বেড়ে গেল তাদের কর্মক্ষমতা।

কাজেই সুযোগ যখন পাওয়া যাচ্ছে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দোষ-ত্রুটিগুলো সারিয়ে নিয়ে নিজেকে অন্তুতপক্ষে তিনগুণ বেশি ক্ষমতাশালী করে নেয়া যাক। কি বলেন? ফলিত মনোবিজ্ঞান আপনাকে মিছে আশ্বাসবাণী শোনাবে না, এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। একের পর এক আপনার সামনে মেলে ধরা হবে আশ্চর্য সব তথ্য; এসব আসমান থেকে টুপ্ করে কারও কোলের উপর পড়েনি, অনেক কষ্ট স্বীকার করে এসব সত্য উদ্ঘাটন করতে হয়েছে মনোবিজ্ঞানীদের। বড় বড় শব্দের সাহায্যে এখানে আপনাকে অনুপ্রাণিত করা হবে না, সহজ বাস্তব সত্য জানতে পারবেন, পরিষ্কার বুঝতে পারবেন ঠিক কোন্ পথে

চলে মানুষের দেহ-মন, কোথায় সীমাবদ্ধতা, কোন্ দিকে রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা।

তিনটে ব্যাপারের উপর নির্ভর করে মানুষের জীবনের যত যা অর্জন। প্রথম, কি ধরনের গুণ বা যোগ্যতা নিয়ে সে জন্মেছে। দ্বিতীয়, কতখানি দক্ষতার সাথে সে এই যোগ্যতা প্রয়োগ করছে বাস্তব জীবনে। তৃতীয়, কোন্ পরিবেশে সে প্রয়োগ করছে নিজের যোগ্যতা।

কোন বিশেষ গুণ বা যোগ্যতা নিয়ে জন্মাবার পরামর্শ কেউ কাউকে দিতে পারে না। তবে পরিবেশের বেশ কিছুটা পরিবর্তন সাধন করে তাকে যতটা সম্ভব অনুকূল অবস্থায় আনবার ব্যাপারে এবং জোরের সাথে নিজের গুণের পূর্ণ প্রয়োগের ব্যাপারে আমাদের অনেক কিছুই শোনাতে পারে ফলিত মনোবিজ্ঞান।

অনুকূল পরিবেশ

নিজের ভিতরটা সামান্য অদল বদল করে নিয়ে কিভাবে আমরা কয়েকগুণ বেশি ক্ষমতার অধিকারী হতে পারি সে আলোচনায় প্রবেশ করবার আগে বাইরের ব্যাপারটা সেরে নেয়া যাক। কারণ ভিতরটা বাইরের পরিবেশের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। বাইরের প্রতিকূলতা সাধ্যমত ঠিক করে নিতে পারলে মনের ভিতরটা ঠিক করে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। তাই প্রথমে দেখব আমরা যে পরিবেশে চলছি, ফিরছি, কাজ করছি, সেটাকে কতখানি অনুকূলে আনা যায়।

যে কামরায় বসে আমরা কাজ করি সেটা সুন্দর আসবাব দিয়ে পরিপাটি করে সাজানো থাকলে যে কাজের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় সে কথা বলাই বাহুল্য। এই ব্যাপারটাকে সামান্য ভেবে উড়িয়ে দেয়া ঠিক নয়। যতটা সম্ভব কাজের ঘরটাকে যার যার সাধ্যমত সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে নেয়া দরকার। এলোমেলো, নোংরা ঘরে বসে যে অপূর্ব কোন উপন্যাস বা কাব্য লেখা অস-

স্তব, তা বলছি না—তবে পরিবেশটা যে লেখার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিজের উপর চাপ পড়বে বেশি।

আলো

যাঁরা রাত জেগে কাজ করেন, কিম্বা যাঁদের কাজের ঘরে দিনের বেলাতেও যথেষ্ট পরিমাণে আলো আসে না, তাঁদের বিশেষ করে আলোর ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার দরকার আছে। ঘর সাজানোর চাইতে উপযুক্ত আলোর ব্যবস্থা করা অনেক বেশি জরুরী। আলোটা যেন কোথাও অতিরিক্ত জোরাল, আবার কোথাও খুব ম্লান না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সারাটা ঘরে যতটা সম্ভব সমান ভাবে ছড়িয়ে পড়া দরকার আলোটা যাতে প্রকট ছায়া বা অতি উজ্জ্বলতা চোখকে পীড়া না দেয়।

এজন্যে ঘরের চারপাশের দেয়ালে যদি চারটে বা তার বেশি বাতির ব্যবস্থা করা যায় সেইটেই সবচেয়ে ভাল। লেখা, পড়া, সেলাই, ঘড়ি মেরামত, টাইপ কম্পোজ বা এই জাতীয় কাজে যথেষ্ট পরিমাণ আলোর ব্যাপারে খুবই সাবধান হওয়া দরকার। চোখদুটোকে যখনই কোন খাটনির কাজে ফেলছেন তখনই তার উপযুক্ত পরিবেশের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। নইলে কাজের ক্ষমতা অনেক কমে যাবে আপনার। অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়বেন।

ঠিক কতটা আলো দরকার? যে জায়গার উপর চোখ ব্যবহার করছেন তার একফুট দূরে যদি দশটা মোমবাতি জ্বলে তাহলে

যতটা আলো হবে, ঠিক ততটা। বড় কোন ঘরে ইলেকট্রিক বাতির নিচে কাজ করছেন—তখন আন্দাজটা পাবেন কি করে? কত পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বলা দরকার? এটা বের করতে হলে ঘরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ জেনে নিয়ে মেঝের আয়তন কত বর্গফুট তা বের করতে হবে আপনাকে দৈর্ঘ্যের সাথে প্রস্থের গুণ দিয়ে। ধরুন, মেঝের আয়তন হল একশো পঞ্চাশ বর্গফুট। একে আড়াই (২·৫) দিয়ে গুণ করলেই বেরিয়ে যাবে মোট কত ওয়াটের বাল্‌ব প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দাঁড়াচ্ছে তিনশো পঁচাত্তর। যদি ঘরের ছাত খুব উঁচু হয়, কিম্বা দেয়ালগুলো গাঢ় কোন রঙের হয় তাহলে লাগবে আরও বেশি। যদি আলোটা সরাসরি নিচের দিকে না এসে পরোক্ষভাবে দেয়ালে প্রতিফলিত হয়ে আসে—তাহলে আরও। সাদা দেয়ালে পরোক্ষ আলোর ব্যবস্থা থাকলে মেঝের বর্গফুটকে অন্তত সাড়ে চার (৪·৫) দিয়ে গুণ করতে হবে আপনার কত ওয়াট দরকার জানতে হলে।

অতিরিক্ত মনে হচ্ছে না? ইলেকট্রিক বিলের কথা ভেবে ভয় হচ্ছে? দূর করে দিন সব ভয়। প্রতিমাসে বৈদ্যুতিক বিল যে কয় টাকা বেশি আসবে তার চেয়ে লক্ষ গুণ বেশি দাম আপনার চোখের। তাছাড়া উপযুক্ত আলোয় ক্লান্তিহীন ভাবে আপনি বাড়তি যা কাজ করবেন, তার ফলে খরচা পুষিয়ে বেশি হয়ে যাবে।

সম্ভব হলে এখুনি হিসেবটা করে ফেলুন না? কত ওয়াট বাল্‌ব দরকার আপনার ঘরে? ঠিক যত দরকার তার অর্ধেকও কি

আছে ? যদি না থাকে, কবে এটার ব্যবস্থা করছেন ? আজ, না কাল ? যত শীঘ্রি হয় ততই আপনার জন্যে মঙ্গল। বিশ্বাস করুন, অবাক হয়ে যাবেন আপনি উপযুক্ত আলোয় কাজ করবার সুযোগ পেলে। মনটাই অন্য রকম হয়ে যাবে।

এ প্রসঙ্গে আরও দুয়েকটা জরুরী কথা খেয়াল রাখবেনঃ একটা বেশি পাওয়ারের বাল্বের চেয়ে বিভিন্ন দেয়ালে কয়েকটা অপেক্ষাকৃত কম পাওয়ারের বাল্ব থাকলেই আপনার সুবিধে হবে—আলোটাও ভাল আসবে, আর কাজের সময় ছাড়া অন্য সময়ে বেশির ভাগ বাতি নিভিয়ে রেখে খরচও বাঁচাতে পারেন। আরেকটা কথা : বাল্বের জ্বলন্ত তার বা ফিলামেণ্ট যেন আপনার চোখে না পড়ে সে ব্যবস্থা করা দরকার। যদি শেড দিয়ে ফিলামেণ্ট পুরোপুরি ঢাকতে না পারেন, ক্লিয়ার বাল্ব না কিনে হোয়াইট-এনামেল করা ফ্রস্টেড বাল্ব কিনুন। জ্বলন্ত ফিলামেণ্ট চোখের জন্যে খুবই ক্ষতিকর : শুধু বিরক্তিকরই নয়, ক্লান্তিকরও—মানুষের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়। কাজেই কেবল কাজের ঘরই নয়, বাড়ির সব ঘরেই এই ক্ষুদে সূর্যগুলো থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিন।

যাঁরা চোখের কাজ বেশি করেন তাঁদের প্রত্যেকের প্রতিবছর অন্তত একবার করে আই স্পেশালিস্টকে দিয়ে চোখ পরীক্ষা করিয়ে নেয়া দরকার। চোখের ত্রুটি কিন্তু নিজের থেকে বোঝা খুবই মুশকিল। ভয়ংকর মাথাধরা, চোখ থেকে পানি পড়া, বা চোখ লাল হয়ে যাওয়া, ইত্যাদি লক্ষণ দেখলে আমরা চোখের

ডাক্তারের শরণাপন্ন হই, নতুবা ধরে নিই ঠিকই আছে চোখ। এটা ভুল। চোখের ক্রটি খুব ধীরে ধীরে যখন বাড়ে তখন আমরা সেই ক্রটির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি বলে সহজে টের পাই না যে চোখটা খারাপ [illegible] যাচ্ছে। আমার এক সাংবাদিক বন্ধুর কথা শুনেছি [illegible] াস এইটে উঠে হঠাৎ স্কুল থেকে চোখ পরীক্ষার ব্যবস্থা হওয়ায় টের পেলেন যে বাম চোখে তিনি প্রায় কিছুই দেখেন না। হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন তিনি হঠাৎ এই নির্মম সত্য জানতে পেরে। আপনাকেও যাতে কাঁদতে না হয় সেজন্যে এক্ষুণি চোখটা পরীক্ষা করিয়ে নেয়া ভাল। চোখে সামান্য ক্রটি থাকলেই যখন-তখন মাথা ধরা, ক্লান্তি আর অপারগতা এসে পিছিয়ে দেয় কাজের গতি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একটা চশমা নিলে ঠিক হয়ে যায় সব। চোখটা কবে পরীক্ষা করাচ্ছেন? আজ? না কাল?

তাপমাত্রা

আলোর মতোই উত্তাপেরও মস্ত ভূমিকা রয়েছে মানুষের কাজের পরিমাণ বাড়ানো বা কমানোর ব্যাপারে। বিশেষ করে আমাদের দেশে এটা খুবই প্রযোজ্য। গবেষণার ফলে জানা গেছে শীত-কালের চেয়ে গরম কালে আমাদের প্রায় সব কাজেই ভুলের মাত্রা বেড়ে যায় অনেক। শারীরিক, মানসিক—দুই ধরনের কাজেই।

উত্তাপ যখন নব্বই ডিগ্রী ফারেনহাইটে পৌঁছে তখন শীত-কালের তুলনায় মানসিক কাজে ভুলের মাত্রা বেড়ে যায় শতকরা

ষাট ভাগ। কেন এটা হয় তার সঠিক কারণ এখনও বের করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু এটা যে হয় তা প্রমাণিত সত্য। কর্মক্ষমতা কমে যায় অনেক : শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে হতে পারে, কিম্বা অভ্যন্তরীণ রাসায়নিক পরিবর্তনের জন্যেও হতে পারে এটা। প্রফেসর পাটারের মত তাপমাত্রা বাড়লে শরীরের অভ্যন্তরে রাসায়নিক ক্রিয়াকর্ম বৃদ্ধি পায়, ফলে আবর্জনা জমে বেশি। কিন্তু অক্সিজেন গ্রহণের পরিমাণ একই থাকে বলে সে সব পরিশোধনের কাজ পুরোপুরি হয় না। ফলে আবর্জনা জমতে জমতে দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ে শরীর, কাজের দক্ষতা হ্রাস পায়।

হিসেব করে দেখা গেছে যে-কোন ধরনের কাজের জন্যে সবচেয়ে উপযোগী তাপমাত্রা হচ্ছে আটষট্টি ডিগ্রী ফারেনহাইট। তাপমাত্রা যদি এর উপরে বা নিচে থাকে তাহলে গুণগত বা পরিমাণগত, কিম্বা উভয় দিক থেকেই কাজের অবনতি ঘটে। আমাদের দেশে তাপমাত্রাকে আয়ত্তে আনা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার, কিন্তু যাঁর সুযোগ আছে তিনি এই তথ্য কাজে লাগিয়ে উপকৃত হতে পারেন।

কাজের সময়

দিনের কোন্ সময়টা কাজের জন্যে সবচেয়ে বেশি উপযোগী?

বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য কবিকে বলতে শুনেছি : দিনের বেলায় নাকি তাঁর কিছুই খেলে না মাথায়, সারাদিন কোন কাজই করতে পারেন না ভাল মত। কিন্তু যেই সন্ধ্যেটা নামল, ওমনি

চাঙ্গা হয়ে ওঠেন তিনি, রাত যত বাড়ে ততই নাকি নতুন নতুন আইডিয়া আসতে শুরু করে তাঁর মাথায়। একজন বৈজ্ঞানিকের কথা জানি, যিনি সারাটা দিন কোনমতে কাটিয়ে দিয়ে সত্যিকার কাজ শুরু করেন ঠিক রাত আটটায়, তখন থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করে ঘুমাতে যান। এটা কি স্বাভাবিক? ফলিত মনোবিজ্ঞান কি বলে?

ফলিত মনোবিজ্ঞান বলে সাধারণ মানুষের জন্যে ঐ সময়টা সৃষ্টিশীল কাজের উপযোগী সময় নয়। এই কবি ও বৈজ্ঞানিক কেউই সৃষ্টিশীল কাজের জন্যে ঠিক উপযোগী সময় বেছে নেননি। এই নিয়মে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন ঠিকই, কিন্তু ফলিত মনোবিজ্ঞানের নির্দেশিত সময়ে কাজে নামলে, বলা যায় না, হয়ত দেশকে তাঁরা আরও ভাল কিছু দিতে পারতেন।

দিনের কাজ শুরু করবার পর থেকে সারাটা দিন একটানা একই রকম কর্মক্ষমতা থাকে না মানুষের, ঘড়ির কাঁটার সাথে সাথে এর কম-বেশি হয়। শারীরিক ও মানসিক উভয় ধরনের কাজেই পরীক্ষা করে দেখা গেছে দিনের বিভিন্ন সময়ে প্রায় একই নিয়মে ওঠানামা করে শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীর কাজের ক্ষমতা ও দক্ষতা। সকাল আটটা থেকে দশটার মধ্যেই বেশির ভাগ মানুষের কাজের ক্ষমতা নেমে চলে আসে 'উঁচু' থেকে 'মাঝারি'র কাছাকাছি ; দশটা থেকে একটা পর্যন্ত প্রায় সমানই থাকে কার্যক্ষমতা—খানিকটা নেমে 'মাঝারি' থেকে সামান্য উপরে থাকে ; কিন্তু বেলা একটা থেকে চারটে পর্যন্ত প্রায় খাড়াভাবে নেমে আসে রেখাচিত্র,

কার্যক্ষমতা নেমে যায় একেবারে 'নিচু'তে। বিকেল চারটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত আবার বাড়তে থাকে ক্ষমতা, কিন্তু 'মাঝারি' থেকে বেশ অনেকটা নিচেই রয়ে যায় সেটা। তারপর আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত ধীরে ধীরে কমে আবার কার্যক্ষমতা চলে আসে 'নিচু'র কাছাকাছি।

দেখা যাচ্ছে, বেলা যত বাড়ে কাজের ক্ষমতা আমাদের ততই কমে যায়। শেষের দিকে সামান্য কাজের জন্যে আমাদের অনেক বেশি সময় ও শক্তি ব্যয় করতে হয়। এটা যে বেলা বাড়ার জন্যে হয় তা নয়, ক্ষমতা হ্রাস পায় অনেকক্ষণ ধরে একটানা কাজ করবার ফলে।

আমাদের প্রত্যেকেরই দৈনন্দিন কাজের মধ্যে কিছু থাকে নিয়ম-বাঁধা কাজ, আর কিছু থাকে নতুন কাজ। নিয়ম বাঁধা কাজ যদি দুপুরের দিকে করব বলে রেখে দিয়ে নতুন ও কঠিন কাজগুলো আমরা সকালের দিকে সেরে নিই তাহলে অনেক বেশি কাজ নামাতে পারব সারাদিনে। সাধারণতঃ আমরা সহজ কাজগুলো সকালের দিকে আগে সেরে নিতে চাই, মনে করি কাজের ফ্লো এসে গেলে কঠিন কাজগুলো সহজ ঠেকবে শেষের দিকে। বাস্তবে তা হয় না। যত পিছিয়ে দেব, কঠিন কাজ ততই কঠিনতর হবে।

? কি শিখলাম? কঠিন, নতুন, আর গুরুত্বপূর্ণ যে-সব কাজ, সে-গুলো সেরে নেব আমরা প্রথমেই। নিয়ম-বাঁধা, সহজ, আর কম জরুরী কাজগুলো করব শেষের দিকে।

কয়েকটি প্রশ্ন

ইলেকট্রিক বাল্‌বের জ্বলন্ত ফিলামেন্ট কি চোখে পড়ছে আপনার ? ঠিক যতটা আলো দরকার, পাচ্ছেন ? ঘরের তাপমাত্রা আটষট্টি ডিগ্রী ফারেনহাইটের কাছাকাছি রাখবার কোন কৌশল বের করা যায় ? দরজা-জানালা বন্ধ রেখে ফ্যান ছেড়ে দিলে কি অবস্থা দাঁড়ায় ? কোন্ ধরনের কাজ কখন করছেন ? আর চোখটা ? কাল কখন পরীক্ষা করাচ্ছেন ডাক্তারকে দিয়ে ? কাজের ঘরটাকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে নেয়া যায় না ?

কাজের পরিমাণ

সাধারণতঃ যখন কোন কাজে মন বসে যায় তখন বাইরের গোল-মাল বা ফেরিওয়ালার 'কাগজ আছে···কাগজ' আমাদের চিত্ত-বিক্ষেপ বা বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে না। কিন্তু ডক্টর জন. জে. বি. মর্গানের গবেষণার ফলে জানা গেছে যে হট্টগোলের মধ্যে কাজ করতে যাওয়া ঠিক নয়। এর ফলে কাজটা করতে যতটা দরকার তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি ব্যয় করতে হয় আমাদের। যদি চিত্তবিক্ষেপের কারণগুলোকে আমাদের কাজের এলাকা থেকে দূরে রাখতে পারি তাহলে অনেক সহজে অনেক বেশি পরিমাণ কাজ করতে পারব।

সুতরাং মন দিয়ে যখন কাজ করছি তখন মনটা চট করে যেন অন্য কোনদিকে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা নেয়া দরকার। রেডিও বা টেলিভিশন চালিয়ে রেখে কাজ করতে বসা ঠিক নয়। টেবিলের উপর ঠিক যে কাজটা করছি সেটা ছাড়া আর কোন কাগজ-পত্র বা বই থাকা ঠিক নয়। জানালা বা দরজার দিকে মুখ করে কাজ

করতে বসা ঠিক নয়। এ ছাড়া কাছে-পিঠে দড়াম দড়াম ক্লিপহীন দরজা বা জানালার আছড়ানি, ক্যাঁচক্যাঁচ মরচে ধরা কব্জার আওয়াজ, স্ক্রু ঢিল হয়ে যাওয়া ফ্যানের খুট-খুট, খুট-খুট আওয়াজ, ইত্যাদি সারিয়ে নেয়া একান্ত দরকার। কাজের জায়গাটা একবার ভালমত পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন আপনি কোন্ কোন্ জিনিস সরাতে হবে চোখের সামনে থেকে, আটকাতে হবে কোন্ কোন্ শব্দ। যথাসাধ্য ব্যবস্থা নিয়ে ফেলুন আজই।

বৈচিত্র্য

ডক্টর জে. পি. বম্বার্গার আবিষ্কার করেছেন যে একটানাভাবে একঘেয়ে কাজ না করে মানুষ যদি কাজের মধ্যে সামান্য কিছু বৈচিত্র্য, বা পরিবর্তন আনতে পারে তাহলে অনেক বেশি কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হতে পারে।

যেসব কাজে খানিক পর পর কাজের ধারা পাল্টে যায়, পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সেসব কাজে মানুষ তার পূর্ণ ক্ষমতার প্রায় সবটুকুই ব্যয় করে থাকে, নষ্ট হয় শতকরা মাত্র ৭.৭ ভাগ। কিন্তু একটানা একঘেয়ে কাজে থাকলে পূর্ণ ক্ষমতার শতকরা ৩৬.৮ থেকে ৩৯.৪ ভাগই নষ্ট হয়ে যায় খামোকা।

অর্থাৎ নিজের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি কাজ আদায় করতে হলে কোন একটা কাজ একটানা না করে থেকে থেকে কাজের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন আনা ভাল। শারীরিক পরিশ্রমের বেলায় ত বটেই, মানসিক প্রত্যেকটা কাজের বেলাতেও এই একই নিয়ম

প্রযোজ্য। অংক কষতে কষতে বিরক্তি ধরে গেছে, ইতিহাস নিয়ে বসুন ; লিখতে লিখতে একঘেয়ে লেগে উঠেছে, দরকারী কোন বই পড়ুন ; মোটকথা বৈচিত্র্য আনুন কাজের মধ্যে।

কি করে আনা যাবে সেটা ? আপনার কাজ আপনিই বুঝবেন, একটু চিন্তা করলেই বের করে ফেলতে পারবেন কিভাবে কাজের ধারাটা সামান্য পরিবর্তন করে নিয়ে নিজের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি কাজ আদায় করা যায়। এই তথ্যটা কাজে লাগাতে পারলে দেখবেন একলাফে অনেক দূরে এগিয়ে গেছেন আপনি।

দক্ষতা অর্জন

কোন কাজে দক্ষতা অর্জন করতে হলে প্র্যাকটিস করতে হবে—একথা সবাই জানি। কিন্তু কেমন ভাবে প্র্যাকটিস করলে অল্প সময়ে বেশি দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব, সেটা আমরা সবাই জানি না। ফলিত মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, কোন কিছু শেখার ব্যাপারে অলস বা ঢিলে লোকের পদ্ধতিই সবচেয়ে ভাল। প্রতিবার অল্প সময় নিয়ে অনেকবার করে অভ্যাস করুন, একবারে একটানা অনেকক্ষণ ধরে প্র্যাকটিস করলে তেমন লাভ হয় না। ধরুন, আপনি বাংলা টাইপরাইটিং শিখতে চান। একটানা দু'ঘণ্টা অভ্যাস করলে আপনি যতটা এগোবেন, তার ঠিক দ্বিগুণ এগোতে পারবেন যদি বিশ মিনিট করে এই একই পাঠ ছয় বার অভ্যাস করেন। সময় ব্যয় করছেন সেই দুই ঘণ্টাই, কিন্তু যেহেতু প্র্যাকটিসের সময় কমিয়ে দিয়ে ছয় ভাগে ভাগ করে নিচ্ছেন সময়টাকে,

শিখছেন দ্বিগুণ। কেবল মুদ্রাক্ষরের বেলাতেই নয়, এই জ্ঞান আপনি যে কোন বিদ্যা শেখার ব্যাপারেই ব্যবহার করতে পারেন। হয়ত কোন খেলার কৌশল রপ্ত করতে চান, গাড়ি চালান শিখতে চান, কোন কিছু মুখস্থ করতে চান, বা গিটার শিখতে চান—যে কোন কাজ, যাতে আপনি দক্ষতা অর্জন করতে চান—একটানা অনেকক্ষণ ধরে অভ্যাস না করে কয়েক ভাগে ভেঙে নিন সময়-টাকে। দেখবেন যাদুমন্ত্রের মত কাজ হবে।

অল্প বিরতি

আমেরিকার সেই লোহা-তোলা মজুরদের কথা মনে আছে? ঐ যারা প্রত্যেক বারো মিনিট পর তিন মিনিট করে বিশ্রাম নিয়ে কাজের পরিমাণ বাড়িয়ে নিয়েছিল তিনগুণ?

যাঁরা এই লেখা পড়ছেন, তাঁরা বেশির ভাগই কায়িক নয়, মানসিক পরিশ্রমের কাজ করেন। তাঁদের ওকথা মনে রেখে লাভ কি? আছে, লাভ আছে। যাঁরা মানসিক পরিশ্রম করেন তাঁদের জন্যেও সুখবর আছে ফলিত মনোবিজ্ঞানীদের কাছে। আপনাদের জন্যে প্রতি আধ ঘণ্টায় তিন মিনিট। আধঘণ্টা একটানা কাজ করবার পর গা-হাত-পা ঢিল করে দিয়ে বিশ্রাম নিন তিন মিনিট। চোখ বুজে থাকতে পারেন, কিম্বা জানালা দিয়ে আলস্যভরে চেয়ে থাকতে পারেন বাইরের দিকে, ইচ্ছে হলে গুন গুন করতে পারেন গানের এক-আধটা কলি, বা পায়চারিও করতে পারেন। মোটকথা কাজের থেকে মনটা সরিয়ে অন্য কিছুতে নেয়া দরকার।

তিন মিনিট পর আবার শুরু করুন কাজ। এই বিশ্রামের ফলে দেখবেন আপনার কাজের পরিমাণ বেড়ে গেছে। একটানা কাজ করলে যতটা হয়, দিনের শেষে দেখবেন তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করেও কম ক্লান্ত হয়েছেন।

তবে লক্ষ্য রাখবেন, বিশ্রামটা আবার তিন মিনিটের জায়গায় দশ মিনিট করে ফেলবেন না। কম হলে বিশ্রাম পুরো হয় না, বেশি হয়ে গেলে সময়টা বাজে খরচ হয়ে যায়। মানসিক কাজের মধ্যে আবার প্রকার ভেদ আছে ঃ কেউ শুধু পড়েন, কেউ লেখেন, কারও ফাইল ঘাঁটতে হয়, কাউকে ঘাঁটতে হয় মোটা মোটা ওকালতী বা ডাক্তারী বই—কাজেই সবার জন্যেই 'আধঘণ্টা কাজ, তিন মিনিট বিশ্রাম' প্রযোজ্য হয় না। যার যার নিজস্ব নিয়ম নিজেকেই বের করে নিতে হয়। এক সপ্তাহ খেয়াল করে কাজ ও বিশ্রামের সময়টা একটু কমিয়ে-বাড়িয়ে দেখলে আপনার নিজের ক্ষেত্রে কতক্ষণ কাজের পর কতক্ষণ বিরতি প্রযোজ্য হবে বের করে নিতে আপনার অসুবিধে হবে না।

আজ থেকেই শুরু করুন না এক্সপেরিমেণ্ট? মনে রাখবেন, পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্যে আমি এসব লিখছি না, অপূর্ব ভাষার কারুকার্য দেখিয়ে আপনাকে মুগ্ধ বা বিস্মিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়—আপনি যদি এসব বৈজ্ঞানিক তথ্য নিজের কাজে লাগিয়ে উপকৃত হতে পারেন, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, আমি খুশি হব। কিন্তু যে-কোন বিদ্যা রপ্ত করতে হলে হাতে কলমে করতে হয় সেটা। দেখলে বা শুনলে কিছুটা উপকার হয় ঠিকই, কিন্তু

নিজে সক্রিয়ভাবে না করলে কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণ হয় না। কি-ভাবে কোন্‌দিকে পেনসিলের আঁক দিলে ক হয়, সেটা কেবল দেখলে বা শুনলেই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, নিজে লিখে শিখতে হয় লেখা; কিভাবে গিয়ার শিফট করে গাড়ি চালাতে হয় কেবল বুঝলেই চলে না, নিজে করে শিখতে হয়। কাজেই কোন্ কোন্ উপায়ে নিজের দক্ষতা বাড়িয়ে যে-কোন কাজে নিজের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ ও প্রয়োগ করা সম্ভব, সে-সব কেবল-পড়ে গেলে তেমন কোন লাভ নেই, যদি না এসব বিদ্যা প্রথম সুযোগেই কাজে লাগান যায়।

আরও কয়েকটি তথ্য

এক। প্রত্যেকটা কাজের সহজতম পদ্ধতিটা খুঁজে বের করবার চেষ্টা থাকা দরকার আমাদের মধ্যে। কাজ করতে গিয়ে আমরা বড় বেশি শক্তি ব্যয় করে ফেলি অনর্থক। লিখতে গিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল ব্যথা করে ফেলি, দরকারী জিনিস-পত্র এতই অগোছালো অবস্থায় রাখি যে কাজের সময় পাওয়া যায় না হাতের কাছে, ডিকশনারীটা দূরে রাখি বলে বারবার পড়া বা লেখা ফেলে উঠতে হয় কোন বানান বা অর্থের ব্যাপারে সন্দেহ দূর করতে। একটু গুছিয়ে নিলেই কিন্তু অনেক সময় ও শক্তি বাঁচাতে পারি আমরা।

দুই। হাত দুটোকে যতদূর সম্ভব চোখের বাঁধন থেকে মুক্ত রাখা দরকার। হাত দুটো কখন কি করছে, সর্বক্ষণ সেটার উপর

নজর না রাখলেও চলে। একটু অভ্যাস করে নিলে একই সাথে একাধিক কাজ করতে পারব আমরা। গাড়ি চালাবার সময় চোখ-কে অন্যদিকে ব্যস্ত রেখে অনায়াসে যেমন ক্লাচ টিপে গিয়ার বদল করি, তেমনি টাই বাঁধা, সিঁথি করা, পকেট থেকে কলম বের করে খাপ খুলে পিছন দিকে এঁটে নিয়ে লেখার জন্যে প্রস্তুত হওয়া, প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করা, ম্যাচ বাক্স থেকে কাঠি বের করা, ইত্যাদি হাজারো কাজে আমাদের চোখের কাছে বাঁধা থাকবার আসলে কোন দরকার নেই। চোখকে অন্যত্র ব্যস্ত রেখে অনায়াসে সারতে পারি অসংখ্য কাজ। এটা অভ্যাস করে নিলে অনেক সময় বেঁচে যাবে আপনার।

তিন। ক্রস ট্রেইনিং-এর সাহায্যে আপনি আপনার পারদর্শিতা বৃদ্ধি করতে পারেন। বাম হাত দিয়ে যদি দ্রুত টোকা দেয়া অভ্যাস করা যায়, দেখা যাবে বিনা প্র্যাকটিসেই ডান হাতের টোকা দেয়ার গতি বেড়ে গেছে। এক হাতের অভ্যাসের ফল ভোগ করছে অপর হাতঃ এরই নাম ক্রস ট্রেইনিং।

তবে ক্রস ট্রেইনিং-এর সুবিধে খুবই সীমাবদ্ধ। একটা হাতকে দ্রুত টোকা দেয়ায় অভ্যস্ত করলে অপর হাতের ভার বহন-ক্ষমতা বাড়বে না, শুধু টোকার গতিই বাড়বে। তেমনি এক হাতের ট্রেইনিং-এর ফল শুধু পাবে অপর হাত, পা এর থেকে কোন উপকার পাবে না ; এক পায়ের প্র্যাকটিসের সুফল ভোগ করবে শুধু অপর পা-ই—হাত নয়।

চার। মানুষ সাধারণতঃ নিজের সত্যিকার ক্ষমতার তিন-

ভাগের একভাগও ব্যয় করে না দৈনন্দিন কাজে। ডক্টর ফ্রেডারিক ডাব্লিউ টেইলার, যিনি সাইন্টিফিক ম্যানেজমেন্টের জনক বলে পরিচিত, বলেন: সাধারণতঃ শ্রমিকরা দিনে যতটা কাজ করে, তার তিন বা চার গুণ বেশি করতে পারে যদি কোনভাবে তাদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করা যায়। উৎসাহ বা আগ্রহ যে-কোন ধরনের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করে।

অন্যকে দিয়ে কাজ করাতে না হয় পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে তাকে উৎসাহী ও আগ্রহী করে তোলা সম্ভব, কিন্তু নিজের বেলায়? নিজের উৎপাদন বাড়াব কি করে? কি লোভ দেখাব নিজেকে?

আসলে নিজেকে লোভ দেখাবার কোন প্রয়োজনই পড়বে না আমাদের। উনিশশো পাঁচ সালেই দু'জন জার্মান সাইকোলজিস্ট, এবার্ট ও মিউম্যান, আবিষ্কার করেছেন: কোন কঠিন কাজ করতে গিয়ে জেনে-শুনেও যদি ভান করা যায় যে কাজটা সহজ ও মজার, তাহলে সে-কাজে অনেক দ্রুত উন্নতি করা যায়। এঁরা দু'জন প্রধানতঃ স্মৃতির উপর গবেষণা করেছিলেন, কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ম্যাক চার্লস-এর গবেষণায় দেখা গেছে এটা সব কাজের বেলাতেই সত্য। উৎসাহের ভান করলেই যে-কোন বিরক্তিকর কাজ কিছুক্ষণের মধ্যেই মজার কাজে রূপান্তরিত হয়, ফলে সহজেই উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা যায় অনেকখানি।

কাজেই এখন থেকে আমরা যে কাজই করি না কেন, ধরে নেব সেটা খুব মজার কাজ, ভান করব যেন খুবই আগ্রহ বোধ করছি কাজটা করতে। ফল হয় কি না হয়, করে দেখলেই ত বুঝতে পারব। তাই না?

মানুষ অভ্যাসের দাস। পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়া, মহিলাদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন, খেতে বসবার আগে হাত ধুয়ে নেয়া, সকাল-সন্ধ্যে বই নিয়ে বসা, নিয়মিত ব্যায়াম করা—এসবই অভ্যাস। এটা খারাপ কিছু না। অভ্যাস শব্দটির আগে 'বদ' শব্দ-টি ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দিলেই সেটা খারাপ। নইলে এর মধ্যে খারাপ কিছু ত নেই-ই, অনেক দিক থেকে অনেক উপকার পেতে পারি আমরা যদি একে ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করে ঠিক পথে চালিত করতে পারি।

তিন ধরনের অভ্যাস অর্জন করতে পারি আমরা।

মোটর হ্যাবিটস

সিঁথি করা, জুতোর ফিতে বা গলার টাই বাঁধা, লেখা, টাইপ করা, ইত্যাদি অভ্যাস এই শ্রেণীতে পড়ে। এসবে যত বেশি অভ্যস্ত হওয়া যায়, ততই দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, ভুলের মাত্রা কমতে থাকে,

এসব কাজ চলা কালে অন্য চিন্তা করায় কোন অসুবিধে থাকে না। হাতের উপর নজর রাখবার দরকার নেই।

সেনসরি হ্যাবিটস

শিকারীর চোখ ঠিকই দেখতে পায় কোন্ ডালে বসে আছে ঘুঘুটা, অথচ তার সঙ্গীকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেও সহজে ঠাহর করে উঠতে পারে না। যন্ত্রশিল্পী টোকা দিয়েই টের পায় ঠিক কোন্ তারটা একটু বেসুরো হয়ে রয়েছে। তেমনি রেলওয়ে কোচের অ্যাক্সেল যে-লোকটা পরীক্ষা করে সে তার কান পাকিয়ে ফেলেছে—টোকা দিয়েই টের পায় সামান্যতম ত্রুটি। পড়া জিনিসটাও আসলে বেশির ভাগটাই দর্শনেন্দ্রিয়ের বিশেষ অভ্যাস।

হ্যাবিটস অফ থিংকিং

মানুষের চিন্তাও এক ধরনের অভ্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়। যে যেমন ভাবে অভ্যস্ত করেছে নিজেকে সে ঠিক সেইভাবেই চিন্তা করে। কিছুদিন আগে কাগজে স্মৃমি-হত্যার দুঃখজনক ঘটনা পাঠ করে মর্মাহত হয়েছে দেশের সবাই। কিন্তু সবাই কি একইভাবে নিয়েছে ব্যাপারটাকে ? তা নয়। প্রত্যেকে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছে ব্যাপারটাকে, চিন্তা করেছে নিজস্ব ছাঁচে। মায়েরা নিয়েছে একভাবে, স্কুলের শিক্ষয়িত্রীরা আরেকভাবে, পুলিশ-উকিল-জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের চিন্তায় আইন ও শৃংখলা-রক্ষা প্রসঙ্গে বিভিন্ন

ধরনের চিন্তা খেলেছে, অনেক ষোল-বছর বয়স্ক ছোকরার বাবা অ্যাডোলেসেন্ট ডেলিঙকুয়েনসি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, অন্যান্য ছেলে-ধরারা হয়ত তুয়ো/তুয়ো করেছে ইকবালকে—ওর ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে, চিন্তা করে বের করেছে আরও নিখুঁতভাবে কি করে ছেলে চুরি করা যায়।

কে কোন্ ভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত তার উপরেই নির্ভর করে কে কিভাবে গ্রহণ করবে একটা বিশেষ ঘটনা। চিন্তার বিভিন্নতা অভ্যাসের ফল।

কার কোন্ অভ্যাস গ্রহণ বা বর্জন করা উচিত সেটা বলা মনস্তত্ত্বের কাজ নয়। তবে ফলিত মনোবিজ্ঞান বলে, শুধু বলে তাই নয়, জোরের সাথে বলে, যে সবারই উচিত যত বেশি সম্ভব অভ্যাস আয়ত্ত করা। এর ফলে কাজে ও চিন্তায় অনেক সময় বেঁচে যায়। একজন টাইপিস্টের পক্ষে এক-পাতা টাইপ করা কয়েক মিনিটের ব্যাপার, অথচ অনভ্যস্ত কেউ চেষ্টা করলে কয়েক ঘণ্টা লেগে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। একটা ব্যবসায়িক চিঠির ডিকটেশন দেয়া অভ্যস্ত ম্যানেজারের জন্যে কয়েক মিনিটের ব্যাপার, আমার-আপনার অনেক বেশি সময় লেগে যাবে বক্তব্যটা কিভাবে ভাষায় রূপ দেব সেটা ভেবে বের করতেই।

সময় খুবই মূল্যবান জিনিস। অভ্যাসের হাতে নিজের অনেক কিছু সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন আপনি। দুটো কাজ একসাথে করতেও অসুবিধে নেই। কোন কাজে ভালমত অভ্যস্ত হয়ে গেলে তার পিছনে চিন্তা ব্যয় করবার তেমন দরকার থাকে না,

পেশীগুলো আপনাআপনি অভ্যস্ত নিয়মে করে চলে কাজ, মাথাটা খাটাতে পারেন আপনি অন্যত্র। অভ্যস্ত কাজ পরিচালনার ভার অবচেতন মনের হাতে চলে যায় বলে ভুলের সম্ভাবনাও কমে যায় অনেক।

কাজেই যত বেশি পারেন, বিভিন্ন ব্যাপারে অভ্যাসের হাতে ছেড়ে দেয়ার চেষ্টা করুন নিজেকে। তবে কোন্ ব্যাপারে অভ্যস্ত করবেন নিজেকে সেটা বাছাই করবার সময় একটু সাবধান থাকা দরকার। প্রত্যেকটা ব্যাপারেই নিজেকে অভ্যস্ত করা যায় না—অত সময় কারও হাতে নেই, জীবনটা ছোট। কাজেই শুধু যেসব ব্যাপারে নিজেকে অভ্যস্ত করলে নিজের কাজে শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই আরও বেশি পারদর্শী হয়ে উঠতে পারবেন, সেইগুলোকে বাছাই করে লেগে পড়ুন তার পিছনে।

তবে অভ্যাস কিছুটা অসুবিধেরও সৃষ্টি করে। মানুষকে সহজে সামনে এগোতে দিতে চায় না, পুরনো নিয়মের মধ্যেই আটকে রেখে তার বিকাশকে খর্ব করতে চায়। ঠিক নিয়ম জানা না থাকলে অভ্যাস পরিবর্তন করা খুবই কঠিন কাজ। আমরা অভ্যাসের দাস, না প্রভু হব, সেটা নির্ভর করবে আমাদের পরিবর্তন-ক্ষমতার উপর। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে আমরা যদি নিজেদের পরিবর্তন করে যুগোপযোগী করে নিতে না পারি, তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই পিছিয়ে যাব, মান্ধাতার আমলের নিয়মেই বাঁধা পড়ে যাব, অগ্রগতির সাথে খাপ খাওয়াতে পারব না নিজেদের। কাজেই অভ্যাসকেই ব্যবহার করতে হবে আমাদের অভ্যাসের

শৃংখল কাটার কাজে। আমরা যদি পরিবর্তনে অভ্যস্ত করে নিই নিজেদের, তাহলে এড়াতে পারব এই অসুবিধা।

আর একটা অসুবিধে হচ্ছে, অভ্যস্ত কাজে মনোযোগ রাখা কঠিন বলে বিশেষ কয়েকটা কাজে বিপদ ঘটে যেতে পারে। অভ্যস্ত হয়ে গেলে চোখ বুজে কোন যন্ত্র বা গাড়ি চালানো, বা রোগী অপারেশন করা হয়ত অসম্ভব নয়, কিন্তু তাই বলে এগুলো করতে যাওয়া নেহাতই বোকামি হবে। এসব ক্ষেত্রে সতর্ক থাকবার অভ্যাস গড়ে নিতে হবে, কাজটা যতই সহজ বা যতই রপ্ত হয়ে থাকুক না কেন।

বদভ্যাস

শারীরিক বা মানসিক যেকোন ধরনের কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়াটা আসলে খুব কঠিন কাজ নয়। কঠিন আসলে অভ্যাস ভাঙাটাই।

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর উইলিয়াম জেমস প্রচুর গবেষণার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছেচেন : বদভ্যাসের নাগপাশ ছিন্ন করব ভাবলেই চলবে না, অত্যন্ত জোরের সাথে নিতে হবে সিদ্ধান্ত, নামতে হবে কাজে, এবং একটা ব্যতিক্রমকেও প্রশ্রয় দিলে চলবে না। ধীরে ধীরে কোন বদভ্যাস ত্যাগ করা যায় না (ড্রাগ অ্যাডিক্টদের কথা অবশ্য আলাদা—তাদের জন্যে অন্য ব্যবস্থা করতে হয়)। যেসব বদভ্যাস ত্যাগ করতে উইথড্রয়াল সিমটম দেখা দেয় সেগুলো ছাড়া আর সবগুলোর বেলায় হঠাৎ করে ছেড়ে দেয়াই সবচেয়ে ভাল। এরই জন্যে সিগারেট খাওয়ার হার

কমিয়ে ধীরে ধীরে এটা ছাড়া যায় না, যারাই ছেড়েছেন জোরাল সিদ্ধান্ত নিয়ে হঠাৎ করে ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, কোন অভ্যাস ত্যাগ করতে হলে কেবল বিরত থাকলেই চলবে না, বিকল্প কোন অভ্যাস তৈরি করে নিতে হবে সহজে সফল হতে চাইলে। এমন কিছু বিকল্প গ্রহণ করা দরকার, যেটা করতে ভাল লাগে।

কাজেই সন্তানের কোন বদভ্যাস দূর করতে চাইলে কেবল বারণ করেই ক্ষান্ত হবেন না, তার সামনে বিকল্প তুলে ধরুন। নিজের কোন বদভ্যাস থাকলে সেটাকে গায়ের জোরে ভাঙার চেষ্টা না করে ওটাকে বদলে নিয়ে বিকল্প কোন অভ্যাস গড়ে তুলুন।

পড়ার অভ্যাস, হাঁটার অভ্যাস, গান গাওয়ার অভ্যাস, বা চিঠি লেখার অভ্যাস চমৎকার বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করা যায়। আমার এক বন্ধু ইদানীং সিগারেট ছেড়ে দিয়ে টেনিস খেলায় আসক্ত হয়ে পড়েছেন। সিগারেট ছেড়ে দিয়ে পান-জর্দা খাওয়ার চেয়ে এই ধরনের বিকল্পে সুবিধে হচ্ছে, এসবে শারীরিক ও মানসিক কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যাপারেও সাহায্য পাচ্ছেন।

এবার নিজেকে কয়েকটা প্রশ্ন করুন দেখি? কোন্ অভ্যাসটা ত্যাগ করা দরকার আপনার? কোন্ অভ্যাসটা গ্রহণ করছেন বিকল্প হিসেবে? কবে বদভ্যাসের শৃঙ্খল ভাঙার কাজে হাত দিচ্ছেন? আজ? কাল? পরশু?

ঘুম

একেকজনের ঘুমের পরিমাণ একেক রকম। শিশু ও বৃদ্ধের অনেক

বেশি ঘুমের দরকার। যুবকদের কম। তাদেরও আবার সবার সমান নয়—কারও ছয় ঘণ্টা ঘুমালেই চলে, কারও আট ঘণ্টার কমে ঘুম পুরো হয় না। যারা গড়ে দৈনিক আট ঘণ্টা করে ঘুমায় তারা জীবনের তিন ভাগের একভাগ সময় ঘুমের মধ্যে অচেতন অবস্থায় কাটিয়ে দেয়। ষাট বছর বাঁচলে বিশ বছরই কেটে যায় ঘুমের মধ্যে। এমন কিছুই কি নেই যার ফলে কম ঘুমিয়েও পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করা যায়? দিনে দু'ঘণ্টা করে বাঁচাতে পারলেও প্রতি বছর এক মাস করে বাড়তি সময় আপনি কাটাতে পারেন পূর্ণ জাগরিত অবস্থায়। আছে এমন কোন কৌশল?

আবিষ্কর্তা এডিসন ঘুমাতেন প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় দু'ঘণ্টা, হামবোল্ট ও জন হাণ্টার ঘুমাতেন তিন ঘণ্টা। এর বেশি ঘুমের প্রয়োজন পড়ত না তাঁদের। দু'তিন ঘণ্টাতেই বিশ্রাম হয়ে যেত পূর্ণ মাত্রায়।

আমার-আপনার পক্ষে এত কম ঘুমিয়ে শরীর ঠিক রাখা হয়ত সম্ভব না-ও হতে পারে, কিন্তু ঘুমের গতিধারা ভালমত বুঝে নিতে পারলে আমরাও একে বাগে এনে কিছুটা সময় বের করে নিতে পারব।

যখনই ঘুমাতে যাচ্ছেন, প্রথম দুটো ঘণ্টা গভীরতম ঘুম হচ্ছে আপনার। পেশীগুলো সবচেয়ে শিথিল থাকছে, ব্লাড প্রেশার নেমে আসছে অনেকটা, ত্বকের অনুভব-ক্ষমতা কমে যাচ্ছে বেশ কিছুটা। প্রথম দু'ঘটার মধ্যে আপনাকে ঘুম থেকে জাগাতে হলে অপেক্ষাকৃত বেশি হাঁকডাকের প্রয়োজন পড়বে। এর পরের পাঁচ

ছয় ঘণ্টার ঘুমে গড়াগড়িই সার হচ্ছে, হালকা তন্দ্রার মত একটা ঘোরে থেকে যাচ্ছেন, খুব একটা বিশ্রাম হচ্ছে না। একেবারে না হওয়ার চেয়ে এই হালকা ঘুম ভাল, গভীরতা বা বিশ্রামের দিক থেকে প্রথম দু'ঘণ্টার তুলনায় পরবর্তী ছয় ঘণ্টা ঘুম কিছুই নয়।

দুপুরে খাওয়ার পর যদি আধঘণ্টা কি একঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পারেন, ফলিত মনোবিজ্ঞানের গবেষকেরা বলছেন, তাহলে অনায়াসে ভোর রাতের দু-তিন ঘণ্টার ঘুম ছেঁটে বাদ দিতে পারবেন। তবে এটা মনে রাখা দরকার, সকালের দিকের অপেক্ষাকৃত অগভীর ঘুম বাদ দেয়ার জন্যেই দুপুরে ঘুমিয়ে নিচ্ছেন আপনি একঘণ্টা। দুপুরেও ঘুমাচ্ছেন, আবার ওদিকেও পুরো আটটি ঘণ্টা সেঁটে ঘুম দিচ্ছেন—এমনটি বাঞ্ছনীয় নয়। যাঁরা দুই, তিন, বা চারঘণ্টা ঘুমিয়েই পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করছেন, তাঁরা এটা সম্ভব করেছেন সারাদিনে দুই বা ততোধিকবার অল্প অল্প করে ঘুমিয়ে নিয়ে।

আমার পরিচিত কয়েকজন এই রকম ছোট ছোট ঘুমে অনেক উপকার পেয়েছেন। প্রথম দিকে অসুবিধে হয়ঃ যখন খুশি ঘুম আসতে চায় না, একবার এসে গেলে কয়েক ঘণ্টার আগে ভাঙতে চায় না—এই রকম। কিছুদিন অভ্যাস করলে অবশ্য ঠিক হয়ে যায় সব, যখন খুশি ঘুম থেকে ওঠা সম্ভব হয়।

ঘুম নিয়ে নিজে নিজে এক্সপেরিমেন্ট করবার আগে আপনার জেনে রাখা দরকার যে এটা নিয়ে যা খুশি তাই করা বিপদজনক হতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে বেশি দিন পর্যন্ত না খেয়ে টিকে থাকতে পারে মানুষ, কিন্তু পাঁচদিন না ঘুমালে মারাত্মক

প্রতিক্রিয়া হতে পারে শরীরের উপর। কাজেই শারীরিক চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে, লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কম পড়ে না যায়। কম হচ্ছে কিনা বুঝবার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে : এক্স-পেরিমেণ্ট শুরু করবার দশ দিন পরেও যদি নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম থেকে উঠতে কষ্ট হয়—জানবেন পুরো হচ্ছে না ঘুম, আরও দরকার। নিজের প্রয়োজনটা বুঝে নিতে হবে আপনার নিজেকেই।

শেষ কথা : অনর্থক ঘুম কমিয়ে কোন ফায়দা নেই যদি না যে সময়টা বাঁচালাম সেটাকে ভাল কোন কাজে ব্যবহার করা যায়। বাড়তি সময়টুকুতে করবার কিছু না থাকলে সেঁটে ঘুম দেয়াই বরং ভাল। যে সময়টুকু বাঁচাচ্ছেন সেটাকে ঠিকমত ব্যবহারের উপরই নির্ভর করছে ঘুম কমানোর সার্থকতা।

দ্রুত-পঠন

আপনার পড়ার গতি কি রকম ?

মিনিটে দুশো শব্দ পড়েন ? খুবই কম বলতে হবে এটাকে। যদি দুশো ষাটটা শব্দ পড়তে পারেন মিনিটে, তাহলে বলা চলে মোটামুটি। যদি চারশো শব্দ পড়তে পারেন, বলব বেশ ভাল ; যদি ছয়শো পারেন, বলব চমৎকার।

কি লাভ এতে ? পড়তে পারলেই হল, কম বা বেশি দ্রুত পড়তে পারলে বিশেষ কি সুবিধে ?

আজকের দিনে আমাদের সবার হাতেই সময় খুব কম। অথচ যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে অনেক কিছুই জানতে হবে আমাদের। অনেক দিকের খবর রাখতে হবে। আপনি যে লাইনেই যান না কেন, পড়ার হাত থেকে আপনার রেহাই নেই। প্রফেসর, ডাক্তার, উকিল—এঁদের কথা আমরা সবাই জানি। প্রচুর পড়তে হয় এঁদের। আমার এক বন্ধু আর্মিতে গিয়েছিলেন

পড়াশোনার হাত থেকে বাঁচবেন মনে করে। সেদিন কাঁদো কাঁদো হয়ে বলছেন, ক্যাপ্টেন হওয়া পর্যন্ত মোটামুটি নিশ্চিন্ত ছিলেন, এখন মেজর হওয়ার পর প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার দশা হয়েছে পড়ার চাপে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মচারী-দেরও রেহাই নেই পড়ার হাত থেকে। ছ'মাস বন্ধ রাখুন পড়াশোনা, পিছিয়ে যাবেন কয়েক বছর।

বুদ্ধিজীবীদের অনেক বেশি পড়তে হয়, কিন্তু আজকের দিনে যে-কোন লাইনে যাঁরাই উন্নতি করতে চান তাঁদের দিনের অন্তত তিনটে ঘণ্টা ব্যয় করতে হয় পড়াশোনার পিছনে। ধরা যাক, আপনি অতিরিক্ত উন্নতি চান না, কাজেই হু'ঘণ্টা করে পড়েন রোজ। আপনার পাঠের গতি ধরছি প্রতি মিনিটে আড়াইশো শব্দ। যদি গতিটা দ্বিগুণ করে নিতে পারেন তাহলে প্রতিদিন-চারঘণ্টা পড়ার কাজ আপনি সারতে পারেন হু'ঘণ্টাতেই। যদি তিনগুণ করে নিতে পারেন (এটাও সম্ভব!) তাহলে হু'ঘণ্টাতেই আপনি ছয় ঘণ্টার পড়া পড়তে পারেন। সপ্তাহের হিসেব ধরলে দেখা যাবে চোদ্দ ঘণ্টার জায়গায় আপনি পড়ছেন বেয়াল্লিশ ঘণ্টা—অর্থাৎ আটাশ ঘণ্টা বেশি পড়ছেন আপনি প্রতি সপ্তাহে। লাভটা খুব কম মনে হচ্ছে এখন?

কি করে সম্ভব এটা?

প্রথমেই ব্রেকের উপর থেকে পা তুলে নিতে হবে আপনাকে। বেশির ভাগ পাঠকই ব্রেক চেপে ধরে গাড়ি চালান। ফলে যতটা সম্ভব ঠিক ততটা এগোন যায় না। তিনটে দোষ কাটিয়ে উঠতে

পারলেই সব ধরনের পিছুটান কাটিয়ে উঠে তর তর করে এগিয়ে যেতে পারবেন আপনি সামনের দিকে।

প্রথম দোষ

পড়তে পড়তে চট করে আমাদের চোখ চলে যায় আগের পড়া একটা বা দুটো শব্দের দিকে। ব্যাপারটা অনেকটা চার কদম এগিয়ে এক কদম পিছুবার মত। এভাবে দ্রুত এগোন যায় না সামনে। এই যে পিছুটান, এটা ঘটে সাধারণতঃ বদভ্যাসের ফলে। এই বদভ্যাস জন্মে আত্মবিশ্বাসের অভাব থেকে, শব্দ-ভাণ্ডারের স্বল্পতা থেকে, অথবা পড়তে গিয়ে একটা-দুটো শব্দ ডিঙিয়ে যাওয়ার ভ্রম থেকে। নিজেই দেখুন : 'একটা জটিল বাক্যে বার বার জটিল বাক্যে বার বার পিছিয়ে গেলে শুধু পড়ার গতিই নয় অর্থ বুঝতেও গতিই নয়···' কেমন জটিল বাক্যে জড়িয়ে গিয়ে অসুবিধের সৃষ্টি হয়।

বারো হাজার পাঠকের চোখের গতিবিধির ছবি তোলা হয়েছিল আমেরিকায় গবেষণার জন্যে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে প্রতি একশো শব্দে গড়ে পনের বার করে পিছনে সরে আসছে সবার চোখ। এরা সবাই ছিল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, স্কুলের ছেলেমেয়েরা বিশ থেকে পঁচিশবার থমকে দাঁড়িয়ে আগের পড়া শব্দ আবার পড়ে।

মোটামুটিভাবে ধরে নেয়া যায় আমাদের পড়ার সময়ের পাঁচভাগের একভাগ নষ্ট হয়ে যায় এই পিছুটানের ফলে। এই দোষ-

টা কাটিয়ে উঠতে পারলে আপনার পড়ার গতি প্রতি মিনিটে বেড়ে যাবে প্রায় একশো শব্দের মত।

দ্বিতীয় দোষ

অনেকে বড় হয়েও ছোটবেলার অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেন না, পড়তে গিয়ে বিড় বিড় করে উচ্চারণ করেন প্রতিটা শব্দ। এর ফলে পড়ার গতি নেমে আসে কথা বলার গতিতে। এভাবে পড়লে কোনদিন আপনি মিনিটে দুশো শব্দের বেশি পড়তে পারবেন না। পড়ার সময় সত্যিই ঠোঁট নাড়ছেন কিনা বুঝতে হলে ঠোঁটের উপর একটা আঙুল রেখে পড়ুন; দোষ থাকলে টের পেয়ে যাবেন সহজেই।

সবাই ঠোঁট নাড়ে না, কিন্তু বেশির ভাগ পাঠকই স্বরযন্ত্রের মধ্যে উচ্চারণ করে প্রতিটা শব্দ নিজের অজান্তেই। এটাও পিছিয়ে দেয় পড়ার গতি। আপনার এ দোষ আছে কিনা বুঝতে হলে মনে মনে পড়ার সময় তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে আলতো করে টিপে ধরুন কণ্ঠমণিটা দু'পাশ থেকে। যদি সামান্য নড়াচড়া অনুভব করতে পারেন তাহলে বুঝবেন নিজের অজান্তেই নিঃশব্দে উচ্চারণ করে চলেছেন আপনি প্রতিটা শব্দ।

তৃতীয় দোষ

বেশির ভাগ পাঠকই প্রত্যেকটা শব্দ আলাদা আলাদা ভাবে পড়তে অভ্যস্ত। একটা লাইন পড়তে গিয়ে প্রতিটা শব্দে হোঁচট

খেয়ে খেয়ে এগোতে হচ্ছে বলে দেরি হয়ে যায় অনেক। রিসার্চে দেখা গেছে প্রত্যেক বিরতিতে ১'১টি শব্দ গ্রহণ করছে এরা। পড়ার গতি দ্বিগুণ বা তিনগুণ করতে হলে এক নজরে তিন বা চারটি শব্দ একবারে পড়বার অভ্যাস করে নিতে হবে। ছ'টা পড়তে পারলে আরও ভাল।

প্রতিষেধক

এই তিনটি রোগেরই প্রতিষেধক পাওয়া যাবে একটি মাত্র নিয়ম অনুসরণ করলে।—বলছেন কলগেট ইউনিভার্সিটির ডক্টর ডোনাল্ড এ. লেয়ার্ড, পি. এইচ. ডি। সেটা আর কিছুই নয়ঃ যত দ্রুত সম্ভব পড়ার অভ্যাস করুন। যে গতিতে পড়লে আয়েশ বোধ করেন, তার চেয়ে বাড়িয়ে দিন পড়ার গতি। প্রয়োজন হলে জোর খাটান নিজের উপর। এর ফলে পড়া জিনিস আবার পড়বার অভ্যাসটা দূর হয়ে যাবে। নিজেকে ঠেলে সামনের দিকে নেয়ার চেষ্টা করছেন বলে পিছু ফিরে চাইবার সময় পাচ্ছেন না। নিজেকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছেন বলে উচ্চারণ করবার সময় পাবেন না, দূর হয়ে যাবে বদভ্যাসও। আর গতি বাড়িয়ে দিচ্ছেন বলে প্রতি-টা শব্দ আলাদা আলাদা ভাবে না পড়ে বাধ্য হচ্ছেন আপনি তিন বা চার শব্দের একেকটি শব্দগুচ্ছকে একসাথে পড়তে।

প্রথম দিকে মানে বুঝতে অসুবিধে হবে। এ নিয়ে মাথা ঘামা-তে বারণ করছেন 'লুক' পত্রিকার প্রাবন্ধিক জেমস্ আই, ব্রাউন। হাল্কা কোন বিষয়ের উপর লেখা মজার কোন বই নিন। প্রতি-

দিন অন্তত পনের মিনিট করে অভ্যাস করুন দ্রুত-পঠন। নিজেকে মায়া করতে যাবেন না। মানে বোঝা যাচ্ছে না বলে ঘাবড়াবেন না। কিছু দিনের মধ্যেই টের পাবেন শুধু যে বিষয়বস্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছেন তাই নয়, আগের চেয়ে অনেক ভাল বুঝতে পারছেন। তার কারণ দ্রুত পড়ার ফলে আপনার মনোযোগ এদিক ওদিক যেতে পারছে না, যা পড়ছেন তাতেই নিবিষ্ট থাকছে।

আপনার লক্ষ্য যদি প্রতি মিনিটে চারশো শব্দ পাঠ করা হয়, তাহলে ছয়শো শব্দ পড়ার চেষ্টা করুন বিশ দিন, দেখবেন অনেক সহজ মনে হবে মিনিটে চারশো শব্দ পড়া। যদি আপনার লক্ষ্য হয় ছয়শো শব্দ, তাহলে আটশো করে শব্দ পড়ুন মিনিটে—বিশ দিন পর ছয়শো শব্দ মনে হবে পানি। তবে একচোটে অনেক না বাড়িয়ে কয়েকটা ধাপে পাঠের গতি বাড়ানো ভাল।

মিনেসোটা ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীর উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে বিশ দিন দ্রুত-পঠনের অভ্যাসের পর শতকরা বাহাত্তর জনের আগের চেয়ে পাঠের গতি বেড়ে গেছে দ্বিগুণ, বিশজনের হয়েছে তিনগুণ এবং শতকরা আটজনের গতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে চারগুণ। অর্থাৎ, সবারই বেড়েছে।

আপনি চেষ্টা করলে আপনারও বাড়বে। সপ্তাহে আটাশ ঘণ্টার বাড়তি পড়াশোনা কিন্তু চাট্টিখানি কথা নয়। আপনার জীবনের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিতে পারে এই দ্রুত-পঠন অভ্যাস।

কবে থেকে শুরু করছেন? আজই আরম্ভ করলে কেমন হয়?

স্মরণ-শক্তি

মানুষের স্মরণ-শক্তির দুটো দিক আছে। এক, জন্মসূত্রে পাওয়া ; দুই, কর্ষণের মাধ্যমে অর্জন করা। প্রথমটার উন্নতি বা অবনতি ঘটানো যায় না, যে যা পেয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তাকে। কিন্তু দ্বিতীয়টার কম-বেশি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আমাদের ইচ্ছের উপর। ইচ্ছে করলেই বাড়াতে পারি আমরা এটা।

ইচ্ছেটা হবে কেন ? স্মৃতি-শক্তি বাড়িয়ে লাভ কি ?

লাভ সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা করে নিতে পারলে এর চর্চার ব্যাপারে আমাদেরকে আর সাধাসাধি করতে হবে না কারও, নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারব, স্থির করতে পারব কি করা উচিত।

স্মৃতি-শক্তির কথা উঠলেই পরীক্ষা পাশের কথাটা এসে যায় আমাদের মনে, যেন পরীক্ষায় পাশ করা ছাড়া এর আর কোন প্রয়োজন নেই মানুষের জীবনে। আসলে কিন্তু তা নয়। জীবনের সব ক্ষেত্রে স্মৃতি-শক্তির ব্যবহার দরকার হয় আমাদের।

তা না হলে সকালে ঘুম থেকে উঠে আগের দিনের কথা সব ভুলে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে হত আমাদের প্রতিদিন। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, স্মৃতি-শক্তি ব্যবহার করছি আমরা প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে। পরীক্ষা পাশ এর আসল ব্যবহারের তুলনায় খুবই সামান্য ব্যাপার।

স্মৃতি-শক্তির সাহায্যে অনেক সময় বাঁচাচ্ছি আমরা। রোগীর উপসর্গ দেখে রোগ নির্ণয় করছেন ডাক্তার, ওষুধ দিচ্ছেন, পথ্য দিচ্ছেন। রোগটা যে ঠিক কি সেটা যদি ডাক্তারের স্মরণে না আসে, রোগের কারণ, প্রকৃতি ও প্রতিষেধক সম্পর্কে যদি কোন কিছুই তিনি স্মৃতি হাতড়ে না পান, তাহলেই যে তিনি চিকিৎসা করতে পারবেন না তা নয় ; ঘণ্টা কয়েক সময় এবং প্রয়োজনীয় বইপত্র হাতে পেলে হয়ত ঠিকই তিনি চিনতে পারবেন রোগটা, চিকিৎসাও করতে পারবেন—যদি অবশ্য তখনও রোগী তাঁর অপেক্ষায় বেঁচে থাকে। কিন্তু এই ডাক্তারকে ভাল ডাক্তার বলব না আমরা কখনও। কারণ? তিনি তাঁর স্মৃতি-শক্তির যথার্থ ব্যবহার করে সময় বাঁচানোর কৌশলটা রপ্ত করতে পারেননি। যে অধ্যাপক বা বক্তাকে মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রতি দু'মিনিটে একবার করে নোটের দিকে চাইতে হয়, কিম্বা বইয়ের পাতা উল্টাতে হয় তাঁর উপর খুব একটা আস্থা আসে না আমাদের। সময় বাঁচাতে হলে স্মৃতি-শক্তিকে আপনার ব্যবহার করতে হবে পূর্ণমাত্রায়।

আমাদের চিন্তার ক্ষমতাও অনেকখানি নির্ভর করে স্মৃতি-শক্তির উপর। চিন্তা করি আমরা শব্দ এবং তার অর্থ দিয়ে। চিন্তা

করবার জন্যে ছাগলের একটিই মাত্র শব্দ রয়েছে—ব্যা। আমাদের রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। যার যত বেশি রয়েছে সে তত বেশি সরে যেতে পেরেছে 'ছাগল' উপাধি থেকে। আর এই শব্দ আপনা-আপনি তৈরি হয় না আমাদের মধ্যে—স্মরণ রাখতে হয়।

শিল্পীর শিল্পসৃষ্টি আর বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারও সম্ভব হচ্ছে এই স্মৃতি-শক্তির জোরেই। যেটাকে আমরা কল্পনা বলি সেটা সক্রিয় স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। পাঁচ কাঠার একটা ফাঁকা জমি দেখে এলেন; বাসায় বসে ইচ্ছে করলেই আপনি মনের পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন মাঠটা। এটা নিষ্ক্রিয় স্মৃতি। কিন্তু যদি মনে মনে ঐ ফাঁকা মাঠে নিজের খুশিমত একটা ইমারত গড়ে তোলেন, অনেকে বলবে কল্পনা, বললে অবশ্য খুব একটা ভুল বলা হবে না, কিন্তু আসলে এই কাজে আপনি ব্যবহার করছেন আপনার সক্রিয় স্মৃতি-শক্তিকে। পাঁচিল থেকে শুরু করে বাড়ির কাঠামো, জানালা, দরজা, বারান্দা, ব্যালকনি, কার্নিস, চিলেকোঠা —সবই আপনি হাতড়ে আনছেন স্মৃতির মণিকোঠা থেকে, কিন্তু সাজাচ্ছেন নিজের মনের মত করে। বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন জিনিস সংগ্রহ করছেন আপনি, কোন কোনটাকে আবার স্মৃতির উপর ভিত্তি করেই বদলে নিচ্ছেন অল্পবিস্তর। সবটা মিলে যে নতুন ইমারতটা দাঁড়াল সেটা আপনার নিজের সৃষ্টি। কিন্তু কিসের সাহায্যে তৈরি করলেন আপনি এত সুন্দর বাড়িটা? স্মৃতি। স্মৃতির ভাণ্ডারে সংগ্রহ যে শিল্পীর যত বেশি, সৃষ্টিশীল

কাজে সে ঠিক ততটাই বেশি দক্ষতার পরিচয় দেবে, সন্দেহ নেই।

অতএব দেখা যাচ্ছে, শুধু পরীক্ষায় পাশের জন্যেই নয়, আমাদের দৈনন্দিন কাজে, চিন্তায়, কল্পনায়, [illegible]বনে, সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে—মোট কথা সব কিছু[illegible] [illegible]র পড়ছে স্মৃতি-শক্তির। এটা বাড়াতে পারলে সবদিক থেকেই অনেক লাভবান হতে পারব আমরা।

কি করে বাড়ানো যায়? ফলিত মনোবিজ্ঞান কোন সাহায্য করতে পারে এ ব্যাপারে?

পারে। প্রথমেই শিখতে হবে আপনার বাজে জিনিস ছেঁটে ফেলা। প্রতিদিন হাজারও কিছু আসছে আপনার সামনে। সবই সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বেছে আলাদা করে নিতে হবে আপনার। এবং এগুলো মনে রাখবেন বলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মনে রাখবেন: ইনটেনশন হ্যাজ এ লট টু ডু উইথ রিটেনশন।

যেটা স্মরণে রাখতে হবে সেটা ভাল লাগলে খুবই ভাল কথা, কিন্তু যদি ভাল না লাগে, যেন ভাল লাগছে—এমনি ভান করতে হবে আপনার। ভান করলেও লাভ আছে, আগের এক আলোচনায় বলেছি সেই গবেষণার কথা। শতকরা ষাটভাগ আপনার বেড়ে যাবে মনে রাখবার ক্ষমতা।

যেটা একবার মুখস্থ করলেন, সেটা সেইদিনই সুযোগ পেলে কাউকে বলুন, সুযোগ না পেলে নিজেই আবৃত্তি করুন বার

কয়েক। মনে রাখবার ব্যাপারে পুনরাবৃত্তির মস্ত বড় ভূমিকা রয়েছে।

সব সময়ই চেষ্টা করা উচিত নতুন-শেখা বিষয়টাকে আগের শেখা বিষয়ের সাথে কোন না কোন ভাবে সংযুক্ত করে নেয়ার। সব ক্ষেত্রে এটা সম্ভব হয় না, তবে যেখানেই সম্ভব এটা ব্যবহার করা উচিত। ইটালীর আকৃতি দেখতে কেমন ? অনেকটা বুটজুতোর মত। জার্মান ভাষায় কুকুরকে কি বলে ? এইচ ইউ এন ডি—হাণ্ড। এই শব্দটি শুনতে অনেকটা ইংরেজি হাউণ্ডের মত শোনায়, হাউণ্ড হচ্ছে এক জাতের কুকুর। জার্মান ভাষায় কুকুরকে বলে হাণ্ড। শিকাগো ওয়ার্লড ফেয়ার কবে হয়েছিল ? ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। কি করে মনে রাখা যায় সালটা ? আমেরিকা আবিষ্কারের চতুর্থ শতবার্ষিকী পালনের জন্যে আয়োজন করা হয়েছিল এই ফেয়ারের। আমরা জানি, আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে। কাজেই ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছিল ; কিন্তু প্রস্তুতি পর্বে ঘর-বাড়ি তৈরি করতে দেরি হয়ে যাওয়ায় মেলাটা হয়েছিল আসলে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। অনেকটা সহজ হয়ে যাচ্ছে না ? এইভাবে যতটা সম্ভব সহজ করে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে মনে রাখার বিষয়বস্তুগুলোকে, মিল বের করার চেষ্টা করতে হবে পরিচিত জিনিসের সাথে।

কোন জনসভায় গেলে কে কি বক্তৃতা দিয়েছিল সেসব আমরা ভুলে যাই অল্পদিনেই, কিন্তু পাশেই বেজায় মোটা এক লোক কি রকম হাঁস ফাঁস করছিল, কিম্বা সামনের বেধড়ক এক ঢ্যাঙা লোক

কেমন পাহাড়ের মত দাঁড়িয়েছিল—সহজে ভুলতে পারি না। কেন? মজার বা উদ্ভট কিছু মনে রাখা সহজ। এসবের ছাপ মনের উপর খুবই গভীর ভাবে পড়ে। কাজেই আমরা যদি সব কিছুতেই মজা খুঁজি, এবং প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলোকে তাড়াহুড়ো না করে মনের উপর গভীর ছাপ ফেলবার সুযোগ দিই, তাহলে মনে রাখা অনেক সহজ হবে।

গবেষণায় দেখা গেছে, নতুন যা কিছুই শিখি না কেন, প্রথম দিনেই তার বেশির ভাগ ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যায় মন থেকে। কাজেই বার ঘণ্টা পার হওয়ার আগেই যা মনে রাখতে চান তার পুনরাবৃত্তি করুন। অবসর সময়ে কল্পনায় রাজা-উজির না মেরে স্মৃতিগুলো ঘষেমেজে নিন। দেখবেন, যা শিখেছেন বহুদিন মনে থাকবে। একেবারে দু'ঘণ্টা ধরে মুখস্থ করবার চেষ্টা না করে একেক বারে বিশ মিনিট করে ছয় বার চেষ্টা করুন—তিনগুণ ফল পাবেন।

কোন কিছু মুখস্থ করবার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হচ্ছে সকাল আটটা থেকে দশটা। সন্ধ্যের দিকে কিছু মুখস্থ করতে গেলে অনর্থক অনেক বেশি জোর খাটাতে হবে আপনার নিজের উপর।

মনে থাকা বা না থাকাটা নিছক ভাগ্যের উপর ছেড়ে না দিয়ে যদি স্মরণ-শক্তিকে নিজের বশে এনে একে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারি, তাহলে আমরা নিজেরাই উপকৃত হব। তাই না? আসুন না, চেষ্টা করে দেখা যাক?

নিজেকে জানো

ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে হলে নিজেকে জানতে হবে আপনার। নিজেকে জানতে পারলেই নিজের অন্তর্নিহিত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণ বিকাশ ও প্রয়োগ সম্ভব—নচেৎ নয়।

কোটিপতি হলেই যে মানুষ সুখী হবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তেমনি রিক্সা টানলেই যে মানুষ অসুখী হবে এমন কথাও জোর দিয়ে বলা যায় না। অনেক সুখী রিক্সাচালক এবং অসুখী কোটিপতির কথা আমরা শুনেছি। টাকার সাথে সুখের সম্পর্ক আছে, অস্বীকার করব না, কিন্তু এটাই সব নয়। সুখী তাকেই বলব, যে তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে অন্তরের ভাবাবেগের একটা সন্তোষজনক ভারসাম্য তৈরি করে নিয়েছে। এই ভারসাম্য আনতে হলে নিজের মধ্যে ঠিক কি ধরনের ভাবাবেগের ধারা রয়েছে সেটা বুঝে নিতে হবে আগে। বুঝে নিয়ে সেই স্রোতের অনুকূলে পাল টাঙিয়ে দেবেন আপনি জীবন-তরীর, অনায়াসে তর তর করে চলে যাবেন বহুদূর। আমরা বেশির

ভাগ মানুষই স্রোতের প্রতিকূলে বৈঠা বেয়ে অনর্থক ক্লান্ত করছি নিজেদের, এগোতে পারছি না বিশেষ।

সুষম ব্যক্তিত্বের গোড়ার কথা হচ্ছে ভাবাবেগের ধারা। এখান থেকেই আসছে আমাদের শারীরিক ও মানসিক তাগিদ বা অনুপ্রেরণা। যদি এই ধারা বুঝে চলি তাহলে চলার গতি আমাদের বেড়ে যাবে অনেক, নইলে পদে পদে প্রচুর ঠোকর খেতে হবে।

আমাদের প্রত্যেকটি ভাবাবেগই যে সমান তীব্র, তা নয়। কোন কোনটা মৃদু এবং পরিবর্তনশীল যেমন, সিনেমা হলে ঠিক পিছনের সীটে বসে কানের কাছে কেউ খংখং করে কেশে চলেছে দু'মিনিট অন্তর অন্তর; কিম্বা থিয়েটার দেখছি, পিছন থেকে কোনও ফাজিল ছোকরা চিনেবাদামের দানা ছুঁড়ে হাত সই করছে আমার টাকের উপর; বিরক্ত হচ্ছি, কিন্তু হল থেকে বেরিয়ে গেলেই চুকে যাচ্ছে ল্যাঠা। কিন্তু কোন কোন ভাবাবেগ থেকেই যাচ্ছে আমাদের মধ্যে সব সময়ের জন্যে, পরিণত হচ্ছে আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এগুলোর যথাবিহিত প্রকাশ হওয়া দরকার দৈনন্দিন কাজে, খেলায়, বিশ্রামে। তা না করে যদি অযথা বাঁধ দিয়ে আটকাতে যাই, দু'কূল ছাপিয়ে আমাদের সবকিছু বন্যায় ভাসিয়ে দেয়ার ভয় আছে। অন্তরের গভীরে আমরা যে যেমন তার তেমনি বিকাশ ও প্রকাশ হওয়া দরকার।

কাজেই আমাদের ভাবাবেগের ধারাটা জানতে পারলে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে আমাদের কাছে আসলে আমরা ঠিক

কেমন। এ ব্যাপারে আমরা কয়েকজন নামজাদা মনোবিজ্ঞানীর সাহায্য নেব।

ভাবাবেগের ধারা অনুযায়ী মানুষকে দু'টি ভাগে ভাগ করেছিলেন জুরিখের ডক্টর কার্ল জে. ইয়াঙ—ইনট্রোভার্ট ও এক্সট্রোভার্ট। পরে ডক্টর এডমণ্ড এস. কংকলিন দেখালেন যে এই দু'টি স্পষ্ট ভাগের মাঝামাঝি একটা বিরাট গোষ্ঠী রয়েছে যাদের পুরোপুরি ভাবে এ দুটোর কোনটাই বলা যায় না—তিনি নাম দিলেন এদের : অ্যাম্বিভার্ট। যদিও এই রকম সাদামাঠা ভাগে মানুষের ব্যক্তিত্বকে ভাগ করতে গেলে সরলতাদোষে বিচার দুষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, মোটামুটি ভাবে নিজের ভাবাবেগের ধারা বুঝতে এর সাহায্য নেয়ায় কোন ক্ষতি নেই।

প্রথমেই বলে নেয়া ভাল, যে আপনি ইনট্রোভার্ট, এক্সট্রোভার্ট বা অ্যাম্বিভার্ট যাই হোন না কেন, তাতে লজ্জিত বা দুঃখিত হওয়ার কিছুই নেই। কোনটা কোনটার চেয়ে খারাপ বা ভাল নয়। প্রচলিত ধারণা হচ্ছে: ইনট্রোভার্ট যারা, তারা স্বার্থপর হয়, নিজের ভাল ছাড়া আর কিছুই বোঝে না, নিজের একটু আরামের জন্যে অন্যের ক্ষতি করতেও বাধে না তাদের। পক্ষান্তরে এক্সট্রোভার্ট যারা, তারাই হচ্ছে সত্যিকার মানুষ, জগতের উপকার ছাড়া আর চিন্তা ভাবনার অবসর নেই তাদের, একেবারে দিলদরিয়া। অজ্ঞতাপ্রসূত এই ভুল ধারণা যদি আপনার মধ্যে থাকে, দূর করে দিন। সব গোষ্ঠীতেই বিরাট সব পুরুষ (ও নারী) মস্ত সব অবদান রেখে গেছেন। আলাদা ঠিকই, কিন্তু কেউ কারও

চেয়ে খারাপ বা ভাল নয়।

এক্সট্রোভার্টকে সহজ কথায় বলা যায় কাজের মানুষ, ইনট্রোভার্টকে ভাবের মানুষ। এক্সট্রোভার্টের কারবার বাস্তব নিয়ে, ইনট্রোভার্টের বিচরণ স্বপ্নে। জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ভাবাবেগের প্রকাশ দেখতে পাই আমরা এক্সট্রোভার্টের কাজে, ইনট্রোভার্টরা চাপা—ভাবাবেগের ধারা তাদের নিজেদেরই চেতনার দিকে ধাবিত। কবি ও দার্শনিকের মধ্যে পাওয়া যায় ইনট্রোভার্টের বৈশিষ্ট্য ; হাসিখুশি, সফল সেলসম্যানের মধ্যে রয়েছে এক্সট্রোভার্টের গুণ।

আর এই দুই দলের মাঝখানে রয়েছে মস্ত এক দল—অ্যামবিভার্ট। এক্সট্রোভার্ট ও ইনট্রোভার্ট, এই দুই দলেরই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে এদের মধ্যে। এরাই কিন্তু মেজরিটি। পৃথিবীর অর্ধেক মানুষই অ্যামবিভার্ট।

কলগেট সাইকোলজিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রচুর রিসার্চের পর নিজের বৈশিষ্ট্য বুঝে নেয়ার জন্যে তৈরি করা হয়েছে একটা প্রশ্নপত্র। স্কুল-কলেজ, ক্লিনিক, ব্যবসা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় এই প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে উপকৃত হয়েছে মানুষ।

এই প্রশ্নপত্রের সার-সংক্ষেপ তুলে দেব আমরা নিচে। তার আগে আবার একবার বলে নেয়া দরকার, এক্সট্রোভার্ট, ইনট্রোভার্ট, অ্যামবিভার্ট—এই তিনদলের কেউ কারও চেয়ে ছোট নয়, সবারই প্রয়োজন আছে দুনিয়ায়। প্রত্যেকটি দলেরই ভাল

এবং মন্দ দিক রয়েছে, গুণ যেমন রয়েছে তেমনি দোষ বা দুর্বলতা, যাই বলুন, রয়েছে। কাজেই, কোন্ দলটা ভাল, কোন গ্রুপে থাকবার চেষ্টা করব, একথা না ভেবে এইসব প্রশ্নের সাহায্যে আমাদের বুঝে নেয়া দরকার আসলে আমরা কে কোন্ দলে আছি। এবং সেই সাথে খুঁজে বের করা দরকার ঠিক কোন্ পথে আমরা নিজেদের পরিপূর্ণ বিকাশ করতে পারব। নিজের ধারাটা বুঝে নিয়ে সেই লাইনে জোরের সাথে কাজ করে যাওয়াই আসল কথা।

নিচের প্রশ্নগুলোর 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' উত্তর দিন। যদি দেখা যায় বেশির ভাগ উত্তরই 'হ্যাঁ' হয়েছে, জানবেন আপনি ইনট্রোভার্ট। 'না' হলে জানবেন আপনি এক্সট্রোভার্ট। যদি দুদিকই মোটামুটি সমান হয়, আপনি অ্যামবিভার্ট—অর্থাৎ, চার্লি চ্যাপলিন, শেরউড অ্যাণ্ডারসন, সারা বার্ণহার্ড আর গ্রেটা গার্বোর দলে।

১। দুশ্চিন্তা পীড়িত করে আপনাকে? কোনও কিছুতে হাত দিতে গিয়ে প্রথমেই দুর্ঘটনা, দুর্বিপাক বা দুর্ভাগ্যের কথা মনে আসে?

২। কারও কটু কথায় চট করে আঘাত পান? কথাটা সরাসরি যদি আপনাকে বলা নাও হয় তবু নিজের ঘাড়ে টেনে নিয়ে দুঃখ বোধ করার অভ্যাস আছে?

৩। আপনি কি স্পষ্ট বক্তা? যে যাই মনে করুক সত্যি কথা মুখের উপর বলে দিতে পারেন?

৪। কিছু করতে গিয়ে কার্যকারণ খোঁজেন? প্রতিটা কাজের পিছনে যুক্তির সমর্থন বের করার চেষ্টা করেন? এক্সট্রোভার্টেরা যুক্তি-তর্কের সাহায্যে নিজের কাজের সমর্থন খুব একটা খোঁজে না, নিজেকে বা আর কাউকে কার্যকারণের কৈফিয়ৎ দেয়ার ধার ধারে না।

৫। হুকুম করলে কি আপনার মধ্যে বিদ্রোহের ভাব সৃষ্টি হয়?

৬। কোন কাজে প্রশংসা পেলে কি কাজটা আরও গুরুত্ব দিয়ে আরও ভাল করবার ইচ্ছে হয়? এক্সট্রোভার্টদের তা হয় না। তাদের কথা : প্রশংসা দিয়ে কি হবে, বোনাস বা কমিশন কিছু আছে কিনা সেই কথা বল।

৭। বইপত্রের দিকে ঝোঁক আছে? এই একটু পড়াশোনা করে ভালমত যে-কোন ব্যাপার বুঝে নেয়া, একটু তলিয়ে দেখা, ইত্যাদি?

৮। কোন খেলায় বা জুয়ায় হেরে গেলে ভয়ানক খারাপ লাগে?

৯। একা কাজ করতে পছন্দ করেন? দলবল নিয়ে হৈ-হল্লার মধ্যে কাজ করতে বেশি পছন্দ করে সাধারণতঃ এক্সট্রোভার্টরা।

১০। সূক্ষ্ম, সময়সাপেক্ষ, খাটনির কাজ পছন্দ করেন?

১১। আপনার চাইতে কম যোগ্যতাসম্পন্ন বা কম সফল লোকের সঙ্গ পছন্দ করেন?

১২। সমালোচনাকে (ভাল হোক বা মন্দ হোক) ভয় পান?

১৩। কথা বলার চেয়ে লেখায় কি নিজেকে বেশি ভাল ভাবে প্রকাশ করতে পারেন ?

১৪। সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পছন্দ করেন ? দাওয়াত পেলে কি করে এড়ানো যায় তাই নিয়ে মাথা ঘামান ?

১৫। টাকা বা আর কোন জিনিস কাউকে ধার দিতে কিম্বা কারও কাছ থেকে ধার চাইতে দ্বিধা আসে ?

১৬। নিজের জিনিসপত্র, জামাকাপড়, কাজের টেবিল, বিছানা ছিমছাম রাখতে পছন্দ করেন ?

১৭। নারীর (আপনি নারী হলে—পুরুষের) প্রতি সামান্যই আকর্ষণ বা আগ্রহ রয়েছে আপনার ? এখানে ওখানে ধুপুড়-ধাপ প্রেমে না পড়ে একনিষ্ঠতায় বিশ্বাসী ?

১৮। আপনি কি আলোচনা ও বিতর্ক পছন্দ করেন ?

১৯। বন্ধু নির্বাচনে আপনি কি খুব সাবধানী ?

২০। আপনি কি তেমন অবস্থায় পড়লে লজ্জায় লাল হন ?

প্রশ্নমালার শেষে একটা কথা জানানো খুবই দরকার। সেটা হচ্ছে একজন ইনট্রোভার্ট চেষ্টা করলে নিজেকে এক্সট্রোভার্টে পরিণত করতে পারে। এক্সট্রোভার্টও পারে নিজেকে ইনট্রোভার্টে পরিবর্তন করতে। খুবই জোর খাটাতে হবে নিজের উপর, খুবই কষ্ট হবে, কিন্তু কাজটা একেবারে অসম্ভব নয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলেন, এত পরিশ্রমের চেয়ে যে যেমন তার সেটাকেই মেনে নেয়া উচিত। নিজের অন্তর্নিহিত প্রবণতার বহিঃপ্রকাশের জন্যে কাজ বা

খেলার মাধ্যমে পথ বা আউটলেট তৈরি করে নেয়া দরকার। সবার জন্যেই অসংখ্য পথ খোলা রয়েছে জগতে, নিজের প্রবণতা বুঝে নিয়ে উপযুক্ত রাস্তা ধরলে জীবনটাকে সার্থক ও সফল করে তোলা সবার জন্যেই সম্ভব হবে।

সক্রেটিস বলেছেন : নিজেকে জানো।

মার্কাস অরেলিয়াস বলেছেন : নিজের মত হও।

সেণ্ট পল বলেছেন : নিজের অন্তর্নিহিত গুণকে অবহেলা করো না।

ফলিত মনোবিজ্ঞানী বলছেন : শুধু নিজের অন্তর্নিহিত গুণকেই নয়, অন্যের অন্তর্নিহিত গুণকেও অবহেলা করতে নেই।

সবশেষে তুয়েকটা ব্যক্তিগত কথা। কোন্ দলে পড়লেন আপনি? আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে আপনার কাজের ধারার কোন বিরোধ নেই ত? আপনার ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে আপনার কাজে, খেলায়, বিশ্রামে? সুখ, শান্তি ও সার্থকতার জন্যে এসব কিন্তু অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

পরিশেষ

অনেক বিষয়ে আলাপ হল আমাদের—আপনার-আমার সরাসরি ব্যক্তিগত আলাপ। জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে এইসব আলোচনায় আমি প্রচুর আনন্দ লাভ করেছি। তথ্য সংগ্রহ করতে কষ্ট হয়েছে, অনেক অনেক বই ঘাঁটতে হয়েছে, কিন্তু বিরক্তি আসেনি এক বিন্দুও। আমি চেষ্টা করেছি প্রতিটা বিষয়ে যতটা সম্ভব জেনে নিয়ে তারপর সমাধানের ইঙ্গিত দিতে। শুভেচ্ছায় আমার ঘাটতি ছিল না, তবে মানুষ মাত্রেই ভুল হয়, যদি আপনার চোখে মারাত্মক কোন ভ্রম ধরা পড়ে দয়া করে জানাবেন।

এত বিষয়ে আলোচনার পরও কেন জানি তৃপ্তি আসছে না আমার। মনে হচ্ছে কী যেন বাদ রয়ে গেল তাই এই শেষ পরিচ্ছেদের অবতারণা। ভাবছি টুকরো টুকরো ভাবে জীবনের বিভিন্ন দিক দেখলেও সামগ্রিক ভাবে জীবনটা আবার এক নজর দেখে না নিলে এই ধরনের আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। আসুন, দেখা যাক, কিভাবে চললে মোটামুটি সুস্থ, সুখী জীবন যাপন করা

যায়। আপনার সুবিধে হবে মনে করে এক, দুই করে সাজিয়ে যাচ্ছি আমি জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের জীবনদর্শন।

এক। অতিশয্যের মধ্যে যাবেন না। বিশেষ করে মদ, সিগারেট, ব্যায়াম ইত্যাদি ব্যাপারে।

দুই। শরীরটাকে ভাল রাখুন। খোলা বাতাসে নিয়মিত ব্যায়াম করুন। প্রতি বছর অন্তত একবার মেডিকেল চেকাপের ব্যবস্থা নিন। এমন অনেক ব্যাধি আছে যেগুলো নিজের অজান্তে সংগোপনে বিস্তার লাভ করে। আপাতদৃষ্টিতে ভাল আছেন মনে হলেও সত্যিই ভাল আছেন কিনা নিশ্চিত হওয়া দরকার ডাক্তারী পরীক্ষার মাধ্যমে।

তিন। অসামাজিক হয়ে এক কোণে পড়ে থাকবেন না। মানুষের সাথে মেলামেশা করুন। লোকজনের সমাবেশে যান, প্রতিবেশীর সাথে দেখা করুন, আলাপ করুন।

চার। নিজের প্রতিটা কাজের পিছনে যুক্তি খুঁজবার চেষ্টা করবেন না। সারাদিনে আমরা প্রচুর কাজ করি যেগুলোর তেমন কোন গুরুত্ব নেই। কোন্ জামাটা গায়ে দেব বা কোন্ জুতোটা পায়ে দেব সেসব তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। অনেকে এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে প্রচুর সময় ব্যয় করে থাকেন, বুঝে উঠতে পারেন না কোন্ জামাটা পরবেন, কোন্ কাজটা আগে করবেন, চিঠিটা 'জনাব' দিয়ে শুরু করবেন, না 'প্রিয় রহমান' দিয়ে শুরু করবেন। এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হলে প্রথম যেটা মনে আসে সেটাকেই মেনে নেয়া দরকার কোনরকম দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে

কাছে ভিড়তে না দিয়ে। প্রতিটা ব্যাপারে যদি কেন কি করছেন তার কার্যকারণ আর ব্যাখ্যা খোঁজেন তাহলে পিছিয়ে যাবেন কেবল, এগোতে পারবেন না।

পাঁচ। নিজের ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশে ভয় পাবেন না। আপনার পছন্দ-অপছন্দ, আনন্দ-বেদনা, উদ্যম-হতাশা নিজের মধ্যে চেপে না রেখে কোন না কোন উপায়ে প্রকাশ করুন। ভাবাবেগ চেপে রাখা ভাল না।

ছয়। কিন্তু তাই বলে যখন-তখন ফাঁৎ করে জ্বলে উঠবেন না আবার। প্রবল ভাবাবেগগুলোর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকতে হবে আপনার। রাগ, ঘৃণা, ভয়, এসবকে সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব নয়, সে চেষ্টা করা উচিতও নয়। কিন্তু এগুলোর মুখে শক্ত রাশ পরিয়ে নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা দরকার। টগবগ করে ফুটবে এসব আপনার ভিতর, বেরিয়ে আসতে চাইবে বাষ্পের আকারে। এসব চেপে না রেখে বেরোতে দেবেন আপনি—কিন্তু নির্দিষ্ট পথে। এই বাষ্পকে কাজে লাগাতে পারলে আপনার পক্ষে বিশাল কোন বাষ্পীয় শকট চালনা করা সম্ভব হতে পারে। আক্রমণাত্মক ভাবাবেগ ঠিক পথে ব্যবহার করলে একজন মস্ত খেলোয়াড় বা সার্জেন হওয়া সম্ভব ভয় বা উদ্বেগকে কাজে লাগিয়ে হতে পারেন মস্ত আবিষ্কর্তা; ক্রোধ, অসন্তোষ বা বিদ্রোহকে কাজে লাগিয়ে হতে পারেন বিরাট রাজনীতিবিদ বা সমাজ-সংস্কারক। ভাবাবেগকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে হবে, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা পরিহার করে একে ঠিক পথে চালনা করবার চেষ্টা থাকা দরকার আপনার মধ্যে

সাত। অতিরিক্ত কাজের চাপ বা অতি ব্যস্ততা দুর্বলতার লক্ষণ। যদি দেখেন সহজভাবে দৈনন্দিন কাজ সারা যাচ্ছে না, বুঝতে হবে আপনার কাজের ধারায় কোন গলদ আছে। সেটা শুধরে নিন।

আট। শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই আপনার যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্রাম নিতে হবে। নিজেকে রেসের ঘোড়ার মত সর্বক্ষণ ছোটালে ক্ষয় হয়ে যাবেন অনর্থক, দ্রুত। আচমকা দুরূহ কাজ করতে যাবেন না, নিজেকে একটু গরম হয়ে নেয়ার (ওয়ার্ম-আপ) সুযোগ দেবেন। তেমনি আবার ভারি কোন কাজ করবার পরপরই গভীর বিশ্রাম নিতে যাবেন না, শরীর ও মনে যে চাপ সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে একটু ঢিলে করে নিয়ে তারপর বিশ্রাম করুন।

নয়। শরীর মন সুস্থ রাখতে হলে কাজ, খেলা ও বিশ্রাম—তিনটেই দরকার। কিন্তু এই তিনটেকে আলাদা রাখুন। কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলা, বিশ্রামের সময় বিশ্রাম। প্রতিদিন অন্তত চারটে ঘণ্টা আপনার ব্যয় করা দরকার কাজের বাইরে অন্য কিছুতে।

দশ। দুঃখ-দুর্দশা, কঠোর প্রতিবন্ধকতা, দুর্বলতা, বিফলতা, ইত্যাদি সব মানুষের জীবনেই আসে। এমন অবস্থায় পড়লে কখনোই নিজেকে একা ভাববেন না। জানবেন, আপনার মতই আরও অনেকে অনেক কষ্ট করছে—যারা সোনার চামচ মুখে নিয়ে এসেছে, তারাও। আপনি ব্যতিক্রম নন। আপনার চেয়ে আরও

অনেক দুর্ভাগা ব্যক্তি আরও অনেক কষ্ট করছে ঠিক এই মুহূর্তে। জোরের সাথে যুদ্ধ করে যান।

এগার। যার-তার সাথে যখন তখন দিলখোলা বন্ধুত্ব করা বোকামি, কিন্তু কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকা সবার জন্যেই অত্যন্ত প্রয়োজন। অন্তত দু'তিনজন ত বটেই। তবে এই সাথে মনে রাখা দরকার, বন্ধুকে কিছুই দেব না, শুধু নেব, সেটা চলে না। দিতেও হবে, নিতেও হবে—সেটাই বন্ধুত্ব রক্ষার চাবিকাঠি।

বার। দুঃখ-দুর্দশার কথা নিজের মধ্যে চেপে না রেখে ঘনিষ্ঠ কারও কাছে বলে ফেলুন। দৈনন্দিন জীবনে ছোটখাট হাজারো রকমের ঝামেলা আসে, সেসব নিয়ে হরহামেশা বন্ধু-বান্ধবদের ত্যক্ত করা ঠিক না; কিন্তু সত্যিকার দুঃখ বা দুর্দশা যখন প্রবল আঘাত হানে তখন কারও কাছে বলে ফেলতে পারলে সে-সবের তীব্রতা অনেকখানি হ্রাস পাবে। একা একা ভুলে যাবার কিম্বা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা না করে কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে গিয়ে নিজেকে উদ্বেগমুক্ত করে ফেলুন।

তের। মানুষ যে যেমন, তাকে ঠিক তেমনি ভাবে মেনে নেয়ার চেষ্টা করুন। আপনার বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী যা ভাল বা যা মন্দ সেটা অন্যের ক্ষেত্রে আরোপ করতে যাবেন না।

চোদ্দ। যুক্তিসম্মত লক্ষ্য স্থির করে নিন, চেষ্টা করলে যেখানে পৌঁছানো আপনার পক্ষে অসম্ভব নয়। তারপর সেই-পথে রওনা হয়ে যান।

পনের। আপনার কিছু না কিছু হবি থাকা দরকার। বাগান

করা, হাঁস-মুরগী পোষা, মাছ ধরা, পাখি শিকার, বা শখ করে নিজ হাতে আসবাব তৈরি করা, যাই হোক, এক বা একাধিক হবি আপনার থাকা চাই। তবে খেয়াল রাখবেন, এমন কিছু হবি আপনার গ্রহণ করতে হবে যেটাকে হাতে কলমে কাজ করবার সুবিধে আছে। কেবল শুয়ে শুয়ে ভাবলে চলবে না।

ষোল। মন থেকে না-সূচক চিন্তাভাবনাগুলো ঝেঁটিয়ে দূর করে দিয়ে হাঁ-সূচক ভাবনায় ভরে তুলুন নিজেকে। আপনি যা আশা করবেন বা একান্তভাবে কামনা করবেন, কোন এক অজ্ঞাত কারণে ঘটনা পরম্পরা ঠিক সেই দিকেই মোড় নেবে। এটা নিয়ম। কাজেই ভাল দিকটাই কামনা করা ভাল। কল্পনার সাহায্যে স্পষ্ট ছবি ফুটিয়ে তুলুন মনের পর্দায়, আপনার কামনার আকর্ষণে কাঙ্ক্ষিত বস্তু বা অবস্থা চলে আসবে আপনার দোরগোড়ায়। চেষ্টা করে দেখুন, অবাক হয়ে যাবেন।

সবশেষে আপনার কাছে আমার বিশেষ অনুরোধঃ এ বইয়ে যেসব তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে, দয়া করে সেগুলোকে পুস্তকী-ব্যাপার মনে না করে নিজের জীবনে প্রয়োগ করে এর সুফল উপভোগ করুন। আমি নিজে উপকৃত হয়েছি, আপনিও হবেন, সে ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু সেজন্যে আপনার নিজের চেষ্টায় ত্রুটি থাকলে চলবে না।

প্রয়োগের দায়িত্ব আপনার নিজের। শুভেচ্ছা রইলো।

—ঃ শেষ ঃ—

নিজেকে জানো

বিদ্যুৎ মিত্র

নিজেকে জানতে হবে। জানতে হবে, আসলে আমি কে এবং কি। জানতে হবে, জীবনের কাছ থেকে ঠিক কতটুকু আশা করা যায়। কোন্ পথটা ঠিক—কোন্‌টা ভুল।
শৈশবের কুশিক্ষার প্রভাব কাটিয়ে উঠে সহজ জীবন যাপনের জন্যে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। জানতে হবে, কি করে অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করে বৃদ্ধি করা যায় চিন্তাশক্তি, কর্মক্ষমতা, জ্ঞান, একাগ্রচিত্ততা, স্মরণশক্তি। জানতে হবে, কি করতে হবে অটুট স্বাস্থ্যের জন্যে, দাম্পত্য-জীবনে সুখ-শান্তির জন্যে।
ফলিত মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে পরিবেশকে অনুকূলে এনে আরও অনেক বেশি জোরালো ভাবে বাঁচতে হবে, ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে হবে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে।
সহজ পথনির্দেশ রয়েছে এ বইয়ে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০